ভাঙন

গোপালকৃষ্ণ রায়

প্রতিদিনই এখানে ঝগড়া হয়। কালভার্টের উপর বসে প্রাত্যহিক কলহ শোনেন বিনয়বাবু। বিনয় তলাপাত্র। রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর আধিকারিক। আত্মীয়-স্বজন শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে পঞ্চায়েত এলাকায় নিরিবিলি নিরালা অনুন্নত নারকেল বাগানে বাড়ি

করেছেন। বন্ধুরা বলতেন, শেষ পর্যন্ত তুমি জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি করলে? রাস্তা নেই। স্কুল-কলেজ হাট-বাজারের সুবিধা নেই। সবচেয়ে বড় কথা ডাক্তার নেই। দু কিলোমিটার দূরে কুঞ্জবনে একটা প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার আছে। শোনা যায়, কাগজে-কলমে একজন ডাক্তার থাকলেও, একজন কমপাউন্ডার স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালায়।

বিনয়বাবু সবিনয়ে উত্তর দিতেন, এটা আর কী নতুন কথা শোনালে তোমরা। যেখানেই যাও, সর্বত্র একই ছবি। কমবেশি সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে।

বাড়ি বানাবার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করতেন বিনয় তলাপাত্র। আজ রাস্তা নেই, কাল হবে। ইস্কুল নেই, একসময় মানুষের দাবিতেই তা গড়ে উঠবে। আরে, বাবা, রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি। কলকাতাও নয়। তোমরা জেনে রাখো, এই নিরালা নারকেল বাগান, দশ বছরের মধ্যে কংক্রীটের জঙ্গলে পরিণত হবে। তখন আবার সহস্র কণ্ঠের কলরব আর যানবাহনের যন্ত্রণায় অন্য এক নিরালা নারকেল বাগান খুঁজতে হবে।

বিনয়বাবুর কথা শুনে বন্ধুরা হেসে চলে যেতেন। বিনয়বাবু বলতেন, একদিন এই নারকেল বাগানের উন্নতি দেখে ঈর্ষা করবে। তখন শুধু কপাল চাপড়াবে না— অনুশোচনায় কাতরাবে।

প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরোন বিনয়বাবু। বাড়ি থেকে এক কিমি পথ নিশ্চিন্তে হেঁটে এসে কালভার্টের উপর বসেন। এখানে বসে তিনি সূর্যোদয় দেখেন। বিশাল ক্ষেতি জমির শেষপ্রান্তে একটা ঘন সবুজের রেখা। অনেকগুলো তাল নারকেল ও খেজুর গাছের মাথার উপরে একটা সোনার থালা ধীরে ধীরে উপরে ওঠে। সোনার থালাটা যখন সবচেয়ে উঁচু তাল গাছের মাথায় উঠে আসে, তখন সেই দৃশ্যটাকে নিজের মনের ফ্রেমে বন্দী করেন। চিল চিৎকারে পিছন ঘিরে দেখেন, তখনও খালের পাড়ের ঝুপড়িবাসীদের কলহ চলছেই। এ এক অদ্ভুত জীবন। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ফেরেন, বিনয়বাবু।

শুধু সূর্যোদয় দেখার নেশায় নয়, খালের ধারে ঝুপড়িবাসীদের ঝগড়া আর ছন্নছাড়া জীবনযাত্রা দেখার নেশায় পেয়েছে তাঁকে।

খালের ধারে সারি দিয়ে পঁচিশ তিরিশটা ঝুপড়ি। সব ঝুপড়িই প্রায় একই রকম দেখতে। শুধু পলিথিন সীটের রং আলাদা। বেশিরভাগই নীল। কিছু কালো। ধনুকের মতো বাঁকানো বাঁশের বাখারির গায়ে জড়ানো। সামনেটা ঢাকা। ছোট ঝুপড়ির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সংসার। জৈবিক সুখ দুঃখের এক চালচিত্র।

খুঁটিনাটি নিয়ে ঝুপড়িবাসীদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। মিটেও যায়। আবার তারাই খালের ধারে বসে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জ্বালাযন্ত্রণা বিনিময় করে। ঝগড়া বেশির ভাগ মেয়েদের মধ্যেই সীমিত। প্রাত্যহিক ঝগড়ায় পুরুষদের অংশগ্রহণ বড় একটা দেখা যায় না। বরং মাঝে মাঝে তারাই ধমক দিয়ে বলে, অনেক হয়েছে, এবার ক্ষ্যান্ত দাও। আজকের ঝগড়া একটু আলাদা মনে হয় বিনয়বাবুর কাছে। মনে হয় দু'দলই অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে। জমির অধিকার। আজকাল তো সারা দেশেই জমির অধিকার নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়া নয় 'যুদ্ধ'।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এরকম দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। গ্রামের জমিহারা মানুষগুলো জমির সন্ধানে শহরে আসছে।

কখন থেকে ঝগড়া শুরু হয়েছে, তা জানেন না বিনয়বাবু। তবে ঝুপড়ির পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, ঝগড়া চলছে অনেকক্ষণ। শুধু অধিগ্রহণে নয়, নদীর ভাঙন সহ নানাবিধ কারণে হাজারো মানুষ গৃহহারা হচ্ছে। আর তারাই কাজ আর জমির সন্ধানে শহরে আসছে।

একটি নতুন ঝুপড়ি তৈরি নিয়ে ঝগড়া। বিনয়বাবু ভাবেন, খালের ধারে, একটা ঝুপড়ির সংখ্যা বাড়লো। হয়তো আগামী দিনে আরও বাড়বে। গ্রামের জমিহারা মানুষগুলো শহরেই জমির সন্ধান করবে।

ঝুপড়িবাসী মহিলা উচ্চৈঃস্বরে বলছে, কার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঘর বানাচ্ছ?

নতুন মেয়েটি জবাব দেয় না। হাঁসুয়া দিয়ে একটা বাখারি কাটতে থাকে।

— অনুমতি ছাড়া এখানে 'ঘর' বানাতে পারবে না। কে তোমাকে অনুমতি দিয়েছে?

মেয়েটি নির্বিকার গলায় বলে, তোমরা যাদের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছ, আমিও তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি।

— অনুমতি তো দিই আমরা। আমরা তো তোমাকে অনুমতি দিইনি। ভাঙ্গো, এই 'ঘর' ভাঙ্গো। এখানে আর কারও জায়গা হবে না।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মেয়েটি।

— আমরা তোর ঝুপড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছি।

বলেই তারা ঝুপড়ির দিকে ধেয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। চক্‌চকে ধারালো হাঁসুয়া উঁচিয়ে মেয়েটি ছুটে গিয়ে একজনের চুলের মুঠি ধরে চেঁচিয়ে বলে, হারামজাদি, এক কোপে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দেব।

— ওরে বাবা, মেরে ফেললো গো! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

ততক্ষণে হাঁসুয়া হাতে তাকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর চেপে বসেছে মেয়েটি।

হাঁসুয়াটা গলার কাছে নিয়ে সে বলে, আর একটা কথা বলবি তো— গলাটা

নামিয়ে দেব।

মাটিতে পড়ে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে মহিলাটি। মেয়েটির কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার ভাবখানা এমন, প্রয়োজনে দু-একটা খুন করতেও সে পিছপা নয়।

অনেক আকুতি-মিনতির পর মহিলাটিকে ছেড়ে দেয়।

মেয়েটি বলে, আমার নাম দোপাটি। আমার কাজে বাধা দিলে দু-টুকরো করে খালের জলে ফেলে দেব।

ছাড়া পেয়ে মহিলাটি হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঝুপড়ির দিকে চলে যায়। আপন মনে বলে, কী ডাকাত মেয়ে রে বাবা!

মেয়েটির রণমূর্তি দেখে, কেউ আর কথা বলে না। সকলেই নিজেদের ঝুপড়িতে ঢুকে যায়।

সব কথা তাঁর কানে না এলেও 'যুদ্ধ'টা চাক্ষুষ করেন বিনয়বাবু।

।। দুই।।

ভোরের ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে বারান্দায় বসেন বিনয়বাবু। একটু বেলা হলেও, খবরের কাগজ পান। গোলাকৃতি বেতের টেবিলে চাপা দেওয়া থাকে। দোতলায় বারান্দায় বসে খালের পাড়ের ঝুপড়িগুলি দেখা যায়। বিনয়বাবু বারান্দায় বসেই ঝুপড়িবাসীর জীবনযাত্রার চলমান ছবি দেখেন।

— ও খুড়ি, চা দিয়ে যাও।

ব্রেকফাস্ট নিয়ে বারান্দায় আসে সায়াহ্নে ঝুঁকে পড়া এক মহিলা।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করেন, খুড়ো কী বাজারে গেছে?

— না, বাজারে যেতে হয়নি। মাধব মালোর কাছ থেকে মাছ কিনেছে।

কুঞ্জবন থেকে কয়েকজন সাইকেলের পিছনে অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জ্যান্ত পোনা মাছ নিয়ে কবরডাঙ্গার বাজারে যায়।

নাম প্রমথনাথ। বিনয়বাবু ডাকেন পোসা খুড়ো। ছোটবেলায় একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর প্রাচীন মায়াপুরে প্রমথনাথের সঙ্গে দেখা। সরেজমিনে গঙ্গার ভাঙন দেখতে গিয়েছিলেন বিনয়বাবু। সেখান থেকেই দু'জনকে নারকেল বাগানের বাড়ি নিয়ে আসেন। নিজের গ্রামের লোক। আত্মীয় না হলেও, আত্মীয়ের মতো। বিনয়বাবুও খুশি হন, প্রায় নিরাশ্রয় গরীব সস্ত্রীক প্রমথেরও উপকার হয়। খুড়ি যাবার পর ঝুপড়ির দিকে তাকান বিনয়বাবু। ঝগড়া থেমে গেছে। 'বিজয়ী' মেয়েটি নিজের ঝুপড়ি তৈরিতে ব্যস্ত।

বিনয়বাবু শুনেছেন, ঝুপড়িবাসী পরিবারগুলির বাড়ি-ঘর ছিল, চাষের জমি ছিল— ক্ষেত খামারে কাজ ছিল। কিন্তু গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা তাদের সব গ্রাস করেছে। সেই নিঃস্ব গৃহহীন মানুষগুলি যাযাবরের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পদ্মা কয়েকটি গ্রাম গ্রাস করে নিজের পরিধি বাড়িয়ে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

চাকুরি জীবনের শেষ পর্বে বারকয়েক মুর্শিদাবাদ, মালদা যেতে হয়েছিল তাকে। পদ্মার ভাঙন ও বাঁধের উপর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছিল। পদ্মার ভাঙন রোধ নিয়ে সরকারের কাছে হাজারও অভিযোগ জমা পড়েছিল। তদন্তের ভার পড়েছিল প্রবীণ আধিকারিক বিনয়বাবুর ওপর।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন। পদ্মার ভাঙন যে এত সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারে, বিনয়বাবুর ধারণাই ছিল না। সব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছিলেন। সেচ দপ্তরের কাছে আসুসি গ্রামবাসীর অভিযোগ : ভরা বর্ষায় বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধের মিথ্যা চেষ্টা করছে সেচ দপ্তর। কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু পদ্মার ভাঙন বন্ধ করা যাচ্ছে না।

ভাঙনের চেহারা পদ্মার ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন বিনয়বাবু। কেমন করে ফাটল ধরে, সেই ফাটল কেমন করে চওড়া হয়। একসময় বিশাল ভূমিখণ্ড ঘরবাড়ি গাছ-পালা নিয়ে পদ্মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে কী ভয়ঙ্কর শব্দ। জলের কী ভয়ানক গর্জন। কী বিরাট ঘূর্ণাবর্ত।

নিজের অজান্তে তিনিও একসময় ভাঙনের মুখে পড়েছিলেন। যেখানে দাঁড়িয়ে পদ্মার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছিলেন সেখান থেকে কুড়ি-পঁচিশ গজ পিছনে ফাটল ধরেছিল। বিনয়বাবু খেয়াল করেননি। করবার কথাও নয়। ফাটলের বাইরে দাঁড়িয়েছিল বছর দশেকের একটি মেয়ে। তার অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পেরেছিল, আর মিনিট কয়েকের মধ্যে বিশাল এলাকা পদ্মার গ্রাসে চলে যাবে। মেয়েটি ছুটে এসে বিনয়বাবুকে টেনে বিপজ্জনক এলাকার বাইরে নিয়ে যায়।

—সরে এস, সরে এস।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিনয়বাবু অবাক হয়ে দেখলেন, বিশাল এক ভূমিখণ্ড পদ্মার জলে ভেঙে পড়ল। জলের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অতলমুখী ঘূর্ণি। এর মধ্যে পড়লে বিনয়বাবুর অস্তিত্ব কোনও কালেই খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রাগৈতিহাসিক ঘড়িয়ালের আহার হয়ে যেতেন।

ভাঙনের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে শরীরে কাঁপন ধরেছিল বিনয়বাবুর। মেয়েটি তখনও তাঁকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বিষাদে ম্লান একটি মুখ। চোখের মণিতে বিপন্ন ছায়া।

— তোমাদের ঘর কোথায়?

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সর্বগ্রাসী পদ্মার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েটি বলেছিল, ও-ই খা-নে। আমার ঠাকুমা ওইখানে তলিয়ে গেছে। গভীর রাতে, সবাই যখন ঘুমে, পদ্মা এক ঝটকায় ঠাকুমার ঘর গিলে ফেলেছিল। আমরা কোনওক্রমে ছুটে

Technology That is built on Trust

TESTED AND TRUSTED BY INDIA'S FINEST VEHICLES FOR THE ULTIMATE IN SAFETY AND COMFORT

- Struts / Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks
- Gas Springs

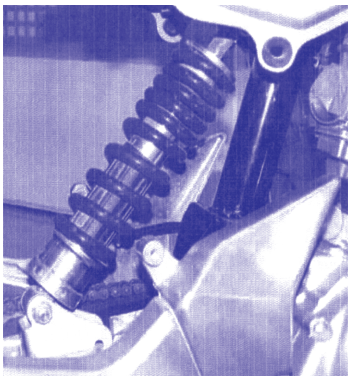

Original Equipment for :
Complete Range of Hero Honda Motorcycles and Scooters, Activa, Eterno, Dio, Unicorn, Shine, Honda City, Honda Civic, Accord, Maruti 800cc Car, Omni, Versa, Wagon-R, Alto, Esteem, Swift, Range of Kinetic Scooters, Hero Mejestic etc.

HI-TECH ▯ LONG LASTING ▯ COMFORTABLE ▯ ULTIMATE IN SAFETY

MUNJAL SHOWA

ISO / TS - 16949 - 2002, ISO - 14001 & OHSAS - 18001

MUNJAL SHOWA LIMITED - 9-11, Maruti Industrial Area, Gurgaon - 122015, (Haryana) India
Phones : 0124-4783000, 4783100, 2341001, Fax : 0124-2341359, 2341346,
E-mail : msladmin@munjalshowa.net

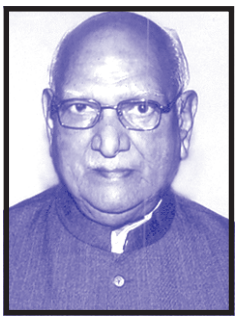

श्री जयनारायण खण्डेलवाल
(मेठी) के 89वें जन्मदिन पर
हार्दिक वधाई

श्रीमती शान्तीदेवी
जयनारायण खण्डेलवाल
चैरिटेबल ट्रस्ट

A
Since 1948

Ahuja

Tailors & Drapers (Regd.)

5/54, Ajmal Khan Road, Karol Bagh,

New Delhi-110 005

☎ Shop : 25764007, 41450181,

Fax : 25738096

e-mail : tailorindia@gmail.com

বেরিয়ে এসেছিলাম। ঠাকুমা পারেনি।

মেয়েটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে পদ্মার ঘূর্ণাবর্তের দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে বিষাদের ছায়া, মনে স্বজন হারানোর হাহাকার। মেয়েটিকে নিজের কাছে টেনে জানতে চেয়েছিলেন, এখন কোথায় থাকো তোমরা?

— আম বাগানে। বলেই, কাতর দৃষ্টিতে বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটি।

মেয়েটির ভিতরে কান্না জমে উঠেছিল। চাপতে গিয়ে তার কণ্ঠে কালো জন্মচিহ্ন বারবার ওঠানামা করছিল।

পদ্মার ভাঙন নিয়ে একটি সার্বিক প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, বিনয়বাবু। যে পদ্মা ভরা বর্ষায় রুদ্র মূর্তি ধরে, সেই বর্ষায় বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধ করা যায়? অথচ সেচ দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে সেই কাজটিই করে চলেছে। এটা ভাঙন রোধের চেষ্টা নয়, অপচেষ্টা। হতভাগা মানুষগুলিকে সান্ত্বনা দেবার নামে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ।

মেয়েটিও বলেছিল, এই ভরা বর্ষায়, পদ্মাকে কী বাঁধা যায়? তুমিই বল!

মেয়েটির কথা শুনে বিনয়বাবুর মনে হয়েছিল, সরকারি অপপ্রয়াস আর কিছু সরকারি আধিকারিকের অসাধুতার বিরুদ্ধে ছোট্ট মেয়েটির এক সবল প্রতিবাদ।

ভাঙন প্রতিরোধের নামে যা চলছে তাকে দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এটা ক্রাইম। অমার্জনীয় ক্রাইম। কিন্তু বিচার কোথায়? কে বিচার করবে? উঁচু থেকে নীচু— সর্বত্র পচন ধরেছে। ভেসে যাওয়া বোল্ডারের টাকায় সেচ দপ্তরের এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারের শ্বেত মর্মর সৌধ নির্মিত হচ্ছে। আর এ একরত্তি মেয়েটি? পদ্মার ঘূর্ণি জলে তার ঠাকুমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পলিটিক্যাল করাপশন! রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার। এ এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন।

শব্দ করেই কথাগুলো বলছিলেন বিনয়বাবু।

— আমাকে কিছু বলছো? মেয়েটির সরল জিজ্ঞাসা।

মেয়েটির মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় পেয়ো না। আবার সব ফিরে পাবে।

মেয়েটি বলেছিল, আমাদের বাড়ির কথাও লিখে দিও।

।। তিন।।

অনেকক্ষণ আগেই 'যুদ্ধ' থেমে গেছে। ঝুপড়িবাসীদের মধ্যে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। দু-চারটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছাড়া ঝুপড়ির বাইরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ইজি চেয়ারটা আরও কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে আনেন বিনয়বাবু। খালের পাড়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। এখনও মেয়েটি ঝুপড়ি তৈরিতে ব্যস্ত। নিশ্চিন্তে এবং নীরবে। ঘন্টাখানেক আগে অত বড় কাণ্ড ঘটে গেছে— এই মুহূর্তে তার কোনও রেশ নেই।

মেয়েটিকে খুব চেনা মনে হচ্ছিল। কোথায় যেন দেখেছিলেন। মনে পড়েও পড়ছে না। এটা বোধহয় স্মৃতিভ্রমের সূচনা। কোনও ঘটনা, কোনও নাম মনে করতে না পারলে, খুব অস্বস্তিবোধ করেন বিনয়বাবু। অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে অন্য কোনও ঘটনার কথা ভাবচে চেষ্টা করেন। বিশে, লাভ হয় না। ঘুরেফিরে ঝুপড়ির মেয়েটি তার সামনে আসে। হঠাৎ স্মৃতির পর্দায় ঝলসে ওঠে একটা ছবি। প্রায় বছর বারো আগে এই মেয়েটিকে দেখেছিলেন। পদ্মার পাড়ে হরিহর পাড়ায়। এই মেয়েটি তাঁকে বাঁচিয়েছিল। মেয়েটি টেনে না সরালে বিশাল ভূমিখণ্ডের সঙ্গে তিনিও পদ্মার অতলে তলিয়ে যেতেন। কী যেন নাম মেয়েটির! একটা আনকমোন নাম। মনে করতে পারেন না বিনয়বাবু। স্মরণ শক্তিতে ভাটার টান চলেছে। হঠাৎ একদিন জোয়ারের টানে মেয়েটির নাম ভেসে আসবে। পদ্মাপাড়ের সেই মেয়েটির চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পরণে ডুরে শাড়ি। বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে কোমরে আঁচল বাঁধা। চুল কী খোলা ছিল? আবার একটা স্মরণের দ্বিধায় আঁটকে যান।

— ওইখানে আমাদের বাড়ি ছিল। পদ্মার দিকে আঙুল তুলে মেয়েটি বলেছিল!

— ঠাকুমাকে নিয়ে গোটা বাড়িটাকে গিলে খেয়েছে পদ্মা।

— তোমার ঠাকুমার দেহ কী পেয়েছিলে?

— না।

মেয়েটির ছোট্ট জবাবের পর ঠাকুমাকে নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করেননি বিনয়বাবু। ফিরে আসবার সময় বলেছিলেন, ভাল থেকো দোপাটি। স্মৃতির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা নামটি আবার মুখ তোলে। খানিকটা স্বস্তিবোধ করেন বিনয়বাবু। ভাবেন, এই কী সেই দোপাটির কণ্ঠে একটা অদ্ভুত জড়ুল ছিল। চোখ তুলে ঝুপড়ির দিকে তাকান। যুদ্ধক্ষেত্র এই মুহূর্তে শান্ত।

খালে এখন জল কম। হাঁটুর নীচে জল। তিন বাঁশের সেতুটা বড় একটা কেউ ব্যবহার করে না। নিজেদের সুবিধার জন্য ঝুপড়িবাসীরাই সেতুটি তৈরি করেছিল। বর্ষার সময় সেতুটির প্রয়োজন হয়।

বিনয়বাবুর বাড়ির দিকে ঝুপড়িবাসীরা খুব কমই আসে। তারা নানা কাজে অন্যত্র যায়। বিনয়বাবু জানেন, ঝুপড়িবাসীরা খাল পার হয়ে এপারে বড় একটা আসে না। তারা ওপার থেকেই ঠাকুরানী বাজারে যায়। সেখানে একটা বিশাল আবাসন গড়ে উঠেছে। প্রায় দুশো পরিবার সেখানে থাকে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের এক মিলন

মন্দির। হাট-বাজার, স্কুল-হাসপাতাল সবই আছে। ঝুপড়িবাসীরা সেখানেই যায়। কাজও পায়। খালের এপারে বিনয়বাবু কার্যত একা। অবশ্য আরও আট দশটি বাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে বিনয়বাবুর পরিচয় হয়নি। কেমন যেন একটা আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন জীবন।

বিনয়বাবুর জানেন, একসময় দ্বিধা কাটিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় গড়ে উঠবে। পরিচয় থেকে একদিন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে। অবশ্য বিনয়বাবু আত্মকেন্দ্রিক না হলেও নিজের মধ্যে থাকতে ভালবাসেন।

বিনয়বাবু দেখতে পান সেই মেয়েটি খাল পার হয়ে তার বাড়ির দিকেই আসছে। সত্যি কী মেয়েটি আসছে নাকি? আসুক। মনের ধন্ধ মিটে যাবে।

সত্যি সত্যি মেয়েটি বিনয়বাবুর বাড়ি এল। নীচে গেটে তালা। দোতলার দিকে তাকায় মেয়েটি। দোতলা থেকেই জানতে চান বিনয়বাবু, তুমি কাউকে খুঁজছো?

ওপরের দিকে তাকাতেই মেয়েটির মুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কণ্ঠে সেই অদ্ভুত জড়ুল। দোপাটি! নাম ধরে ডাকতে গিয়েও ডাকেন না বিনয়বাবু। উৎসাহ সংবরণ করেন।

— তুমি কাউকে চাও?

— একটু নীচে আসবেন, কর্তা।

— দাঁড়াও।

হরিহর পাড়ার সেই ঘটনা বিনয়বাবুর স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়। অবধারিত অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মেয়েটি। কৃতজ্ঞ বিনয়বাবু নিজেই গেট খোলেন। সেই দোপাটি। এই দোপাটিকে ভুলবেন কী করে? আতিশয্য চেপে থাকেন। বিনয়বাবু অতীতকে আর সামনে আনেন না।

— তোমার নাম কী?

— দোপাটি।

নিশ্চিন্ত বিনয়বাবুর বলেন, তুমি কিছু বলবে?

দোপাটি বলে, এখানে কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায়?

বিনয়বাবু বুঝতে পারেন, নিশ্চয়ই কেউ অসুস্থ।

— ডাক্তার?

— আজ্ঞে, আমার ছেলেটার খুব জ্বর। একেবারে লেতিয়ে পড়েছে। একটা কথাও বলছে না।

— পূর্ব পাড়ায় একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। সেখানে নিয়ে যেতে পার।

— কতদূর?

— মাইল দেড়েক তো হবেই।

— তা হউক, আমি ছেলে কোলে নিয়ে একছুটে চলে যাব।

বলেই খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো খালের দিকে এগিয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্ত ভাবেন বিনয়বাবু। আবার সেই কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন। বিনয়বাবু বলেন, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

— আপনি যাবেন?

— চল।

বিনয়বাবু বেশ লম্বা। প্রায় ছ'ফুট। দোপাটির পিছু পিছু ঝুপড়ির কাছে যান। দেখেন, একটা বস্তার ওপর ছেলেটি শুয়ে আছে। ঘাড় হেলে রয়েছে। দোপাটি প্রায় বুকে ভর দিয়ে ঝুপড়ির মধ্যে ঢোকে। ভেতর থেকে দোপাটি বুকে করে যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে চমকে ওঠেন বিনয়বাবু। একটি কঙ্কালসার শিশু। হাড়ের ওপর চামড়ার আবরণ। ওর দেহে প্রাণ আছে কিনা, সন্দেহ হয় বিনয়বাবুর। ঠিক এই সময়ে ছেলেটা সামান্য কাঁকিয়ে ওঠে। বিনয়বাবু বুঝতে পারেন, চামড়ার অন্তরালে প্রায় ধুকধুক্ করছে।

ছেলেকে বুকে নিয়ে দোপাটি বলে, খাল পার হয়ে সড়ক ধরে সোজা গেলেই কী হাসপাতালে পৌঁছানো যাবে?

বিনয়বাবু বলেন, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

বিস্মিত দোপাটি বলে, এই খাল পেরিয়ে তুমি যাবে কর্তা? এত নোংরা জলে তুমি নামবে কী করে?

কথাটি সত্য। বিনয়বাবু কোনওদিন খাল পেরোননি। নড়বড়ে বাঁশের সেতুর ওপরেও পা রাখেননি। তিনি যাতায়াত করেন উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে। মোরামের রাস্তা, হেঁটে যাওয়া যায়— রিক্সাও চলে। মাঝে মাঝে গাড়িও যাওয়া-আসা করে। মোরামের পথ ধরে উত্তর দিকে মাইল খানেক এগোলেই কবরডাঙ্গা। পুরনো কাঠামোর উপর একটি নতুন গঞ্জ গড়ে উঠছে। বাজার আছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি পুরনো চার্চ আছে। শহর ক্রমশ গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। দু-চার বছরের মধ্যে গ্রামীণ পরিবেশ হারিয়ে যাবে।

সাবেকি বড়লোকদের ফলের বাগান ধ্বংস করা হচ্ছে। প্রায় মজে যাওয়া জলাশয়গুলি বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। গড়ে উঠছে বহুতল অট্টালিকা। গত দু'বছরের মধ্যে কবরডাঙ্গার আকাশ রেখা পাল্টো গেছে। আগামী দু'বছরের মধ্যে কবরডাঙ্গার নাম পাল্টে কোনও নেতার নামে নগর হয়ে যাবে। ঐতিহ্যকে কেউ আর সম্মান করতে চায় না। পরিবর্তনের মাধুর্যে মোহিত হয়ে থাকে। দোপাটি বলে, তোমাকে যেতে হবে না, কর্তা। এত নোংরা জলে, তোমাকে নামতে হবে না। দোপাটির কথায় চমক ভাঙে। বলেন, ঠিক আছে। তুমি চল। এইটুকু তো খাল।

দোপাটির আগেই খালে নামেন বিনয়বাবু। সামান্য আর্তকণ্ঠে দোপাটি বলে, সাবধানে পা ফেল কর্তা। জলের নীচে কত কী যে আছে কে জানে!

মৃতপ্রায় ছেলেকে পাঁজাকোলে নিয়ে খালে নামে দোপাটি। সে আগেই শাড়ি হাঁটুর উপর তুলে নিয়েছিল। পিছন ফিরে একবার তাকিয়েছিলেন বিনয়বাবু। বিংশতিবর্ষীয়া একটি যুবতীর পুরুষ্ট

উরু। অবিবাহিত বিনয়বাবু চোখ ঘুরিয়ে নেন।

নোংরা জল পেরিয়ে রাস্তায় ওঠেন তারা। পা ধুতে পারলে ভাল হত। এটা পঞ্চায়েত এলাকা। ডানে-বাঁয়ে তাকান বিনয়বাবু। একটি টিউব অয়েল খুঁজছেন তিনি। কিছুটা এগোবার পর একটা পুকুর পেয়ে যান। হয়তো গাঁয়ের কোনও বড় লোক কোনও এককালে পুকুরটি কাটিয়েছিলেন। দু'দিকে শান বাঁধানো ঘাট। কোথাও কোথাও ইঁট খসে গিয়েছে। হিঞ্চে আর কলমীতে অর্ধেক পুকুর ঢেকে গেছে।

দোপাটি বলে, এই পুকুরে পা ভাল করে ধুয়ে নাও।

বিনয়বাবু ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামেন। পা ধুয়ে আবার উপরে উঠে আসেন। তাকিয়ে দেখেন দোপাটির ছেলের ঘাড় ঝুলে পড়েছে। বুক কেঁপে ওঠে বিনয়বাবুর।

— ছেলেটা বেঁচে আছে তো?

দোপাটি বলে, তুমি ওকে একটু ধর, কর্তা। আমিও পা ধুয়ে আসি।

ছেলেটিকে বিনয়বাবুর কোলে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে দোপাটি। ছেলেটিকে কোলে নিয়েই বিনয়বাবু বুঝতে পারেন, ওর দেহে প্রাণ নেই।

মৃত ছেলে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে তারা। বিনয়বাবুর একবার ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মন সায় দিল না। কী বলবেন তিনি? তার চেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভাল। যা বলবার ডাক্তারই বলুক। দোপাটি ছেলেকে কোলে নিয়ে বলে, ঘুমিয়ে পড়লি, বাবা! এই তো এক্ষুণি পৌঁছে যাব।

হাসপাতালের সামনে বেশ ভিড়। বিনয়বাবু বলেন, তুমি বারান্দায় বস।

সেদিন কী কারণে ডাক্তার নিচেই ছিলেন। দোপাটির ডাক আসে।

বিনয়বাবু, একটা করুণ দৃশ্য দেখবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ভিড় থেকে একটু দূরে সরে যান তিনি।

ছেলেটির গায়ে হাত দিয়েই ডাক্তার দোপাটির দিকে তাকান। স্টেথোটাও রোগীর বুকে নামাবার দরকার হয় না। ডাক্তার বলেন, তোমার সঙ্গে আর কেউ এসেছেন?

— ওই যে, ওই কর্তা জোর করে এলেন।

ডাক্তার তাকাতেই বিনয়বাবু এগিয়ে আসেন। বাংলায় নয়, ইংরেজীতে বলেন, আই নো, হি ইজ ডেড।

ডাক্তার বলেন, তোমার ছেলের আর ওষুধের দরকার নেই। ও আর বেঁচে নেই।

বজ্রাঘাতের মতো নিষ্পন্দ হয়ে যায় দোপাটি। ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়। কয়েক মুহূর্ত। তারপর মৃত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দোপাটি।

।। চার।।

এমন একটা মর্মান্তিক পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন বিনয়বাবু। ছেলেটির মৃত্যু যে অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে, সেটা তাঁর জানাই ছিল। কিন্তু দোপাটির সব আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

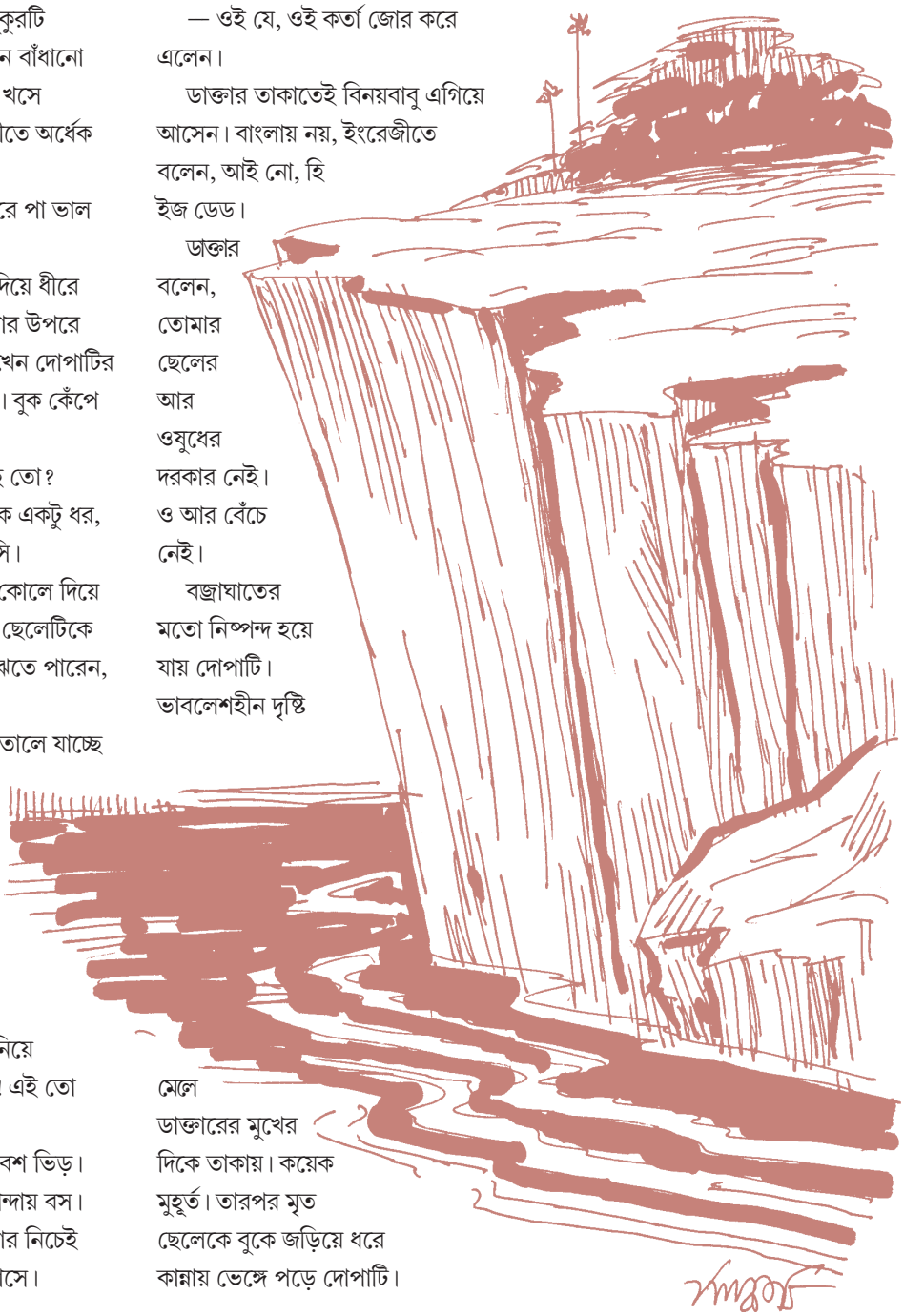

তার কোলেই যে তার ছেলের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে, তা সে বুঝতেই পারেনি। দোপাটির বুকফাটা কান্নায় হাসপাতাল চত্বরে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ডাক্তার বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েটি আপনার কেউ হয়?

— না। ঘন্টা দেড়েক আগে হাসপাতালের খোঁজে আমার কাছে এসেছিল। কী মনে করে কাদা জল মাড়িয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম।

ডাক্তার বলেন, কী আর করবেন, এবার সেই পথে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি।

— মৃত ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়। অ্যাম্বুলেন্স বা কোনও গাড়ি পাওয়া যাবে না, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার মৃদু হেসে বলেন, এখানে শববাহী ভ্যান রিক্সা পাওয়া যায়।

বিনয়বাবু ভ্যান রিক্সা দেখেছেন। কবর ডাঙ্গায় ভ্যান রিক্সা চলাচল করে। বলেন, তাই একটা ঠিক করে দিন ডাক্তার।

কান্না থামাতে বলেননি বিনয়বাবু। দোপাটি নিজেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না রোধ করেছিল। কিন্তু খালের ধারে এসে আবার বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সন্তান হারানো মায়ের কান্না সম্পূর্ণ আলাদা। সে কান্নায় হাহাকার থাকে। কান্না শুনেই ঝুপড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে আসে। কেউ কেউ খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এপারে এসে ঝুপড়িবাসীরা নিজেরাই কান্না জুড়ে দেয়।

— ওমা, ছেলেটা আর নেই! আমাদের সবাইকে রেখে চলে গেল! কোথায় গেলি রে বাবা! ভ্যান রিক্সা ঘিরে ভিড় জমে যায়। সবাই ঘটনাটা জানতে চায়। বিনয়বাবু কী বলবেন? জানেনই বা কতটুকু! তবুও যা ঘটেছে তাই বলেন। একজন মৃতদেহ পাঁজা কোলে তুলে নেয়। দু'জন মহিলা ভ্যান থেকে ধরে নামায় দোপাটিকে।

বিনয়বাবু অবাক হন। ভাবেন, সহানুভূতি ও হৃদয়ানুভূতি গরীবদের সহজাত। এটাই ওদের সম্পদ, এটাই ওদের অলঙ্কার। কাল যে মহিলাকে হাঁসুয়া দিয়ে দু'টুকরো করতে চেয়েছিল দোপাটি, সেই তাকে জড়িয়ে ধরে খাল পার করে দেয়। একটা মৃত্যু রাগ, দ্বেষ, হিংসা সব ভুলিয়ে দিয়ে পুত্রহারা মায়ের শোকের অংশীদার হয়ে উঠেছে।

আত্মীয় বিয়োগ বেদনায় ঝুপড়িবাসী মুহ্যমান। একদিনের পরিচিত এক প্রতিবেশীর জন্য এমন অকৃত্রিম সহযোগিতা এমন নিঃস্বার্থ সহানুভূতি এর আগে আর কখনও দেখেননি বিনয়বাবু। ঝুপড়িবাসীর মানবিকতায় মুগ্ধ হন বিনয়বাবু। বিনয়বাবু একজনকে ডাকেন, বলেন, ওইখানে আমার বাড়ি। আমার সঙ্গে একটু আসবে? লোকটি বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কেন স্যার?

বিনয়বাবু বলেন, ছেলেটির শেষ কাজে আমার কিছু দায় আছে। আমি সেটা পালন করতে চাই।

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বলে, আপনি অনেক করেছেন স্যার। প্রতিবেশীর জন্য বাকিটুকু আমরা করতে পারব।

আর কথা বাড়াল না বিনয়বাবু। মৃত ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেন। দোপাটি ছুটে এসে হাত জোড় করে সামনে দাঁড়ায়। বলে, বাবা, তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। আমাকে মাপ করে দিও।

এইবার বিনয়বাবুর চোখে জল ভরে ওঠে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও ধীরে ধীরে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগোতে থাকেন।

দোপাটি বলে, আমি তোমায় চিনেছি, বাবা। তুমি হরিহর পাড়ায় পদ্মার ভাঙন দেখতে গিয়েছিলে। পদ্মা এখনও ভাঙছে, বাবা। এখনও তোমাদের লোক, ভরা বর্ষায় বোল্ডার ফেলে। গরীব মানুষদের ঠকিয়ে যাচ্ছে।

দোপাটির এই অভিযোগ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করলেও উচ্চ আসনে আসীন মানুষের কানে পৌঁছায় না।

বাড়ি ফিরে আসেন বিনয়বাবু। বারান্দায় বসে দেখতে পান, ঝুপড়িবাসীরা খালের ধারে একটা কবর খুঁড়ছে। দোপাটির ছেলের কঙ্কালসার দেহ সেই কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে।

চোখ বোজেন বিনয়বাবু। স্পষ্ট দেখতে পান এখনও প্রমত্তা পদ্মার ঘূর্ণাবর্তে শত শত বাড়িঘর গাছ-পালা তলিয়ে যাচ্ছে। বিড় বিড় করে বলেন, ওরা কেউ পদ্মার ভাঙন রোধ করতে পারবে না দোপাটি। ওরা লোভী, ওরা অসাধু। ওরা ঠগ। □

সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা—

সৌমেন চক্রবর্তী

হাওড়া

মো : ৯৪৩২৩৩১৯২৫

BIOTECH INTERNATIONAL LTD.

PIONEERS IN COMMERCIALIZATION OF BIOTECHNOLOGY PRODUCTS IN INDIA

BIOLARVICIDES:

BACTICIDE	:	For control of Mosquitoes Vectors for Malaria, Dengue Fever, Filaria, Japanese
SPHERICIDE	:	Encephalitis and Nuisance Mosquitoes and Black-flies Vectors for River Blindness.

MOSQUITO BED NETS :

BIL NET	:	Pyrethroid impregnated / non-impregnated bed nets for intervention if Mosquito bites & to repel / kill adult mosquitoes.

BIOPESTICIDES :

BIOLEP	:	For control of *Heliothis, Plutella,* Bollworms, Fruit & Shoot borers, pests of agricultural crops.
BIODERMA	:	For control if rots, wilts & leaf spot diseases of agricultural crops.

BIOCONTROL AGENTS :

BIOGRAMMA BIOPERLA BIOVIRUS	:	*Trichogramma, Chrysoperla* and NPV For control of pests of agricultural crops.
BIOTRAPS & BIOLURES	:	*Pheromone Traps and Lures* for monitoring & mass trapping of lepidopterous pests.

BOTANICAL PESTICIDES :

NEEMARIN	:	For control of sucking pests and caterpillars.

BIOTECH INTERNATIONAL LTD.

"VIPPS CENTRE", 2 LOCAL SHOPPING CENTRE, BLOCK-EFGH,
MASJID MOTH, GREATER KAILASH-II, NEW DELHI - 110 048, INDIA.

Branch Office : Dutt House, 2nd Floor, 94, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012
Ph. No. 033-22255416 / 22255475

Website : www.biotech-int.com
Tel. Nos. 091-11-2922-0546, 2922-0547
E-mail: info@biotech-int.com

Fax No. 091-11-2922-9166
Gram : INTERCHEM

উপন্যাস

হানাদার ঘুণপোকা বনাম এক রাজকুমার

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

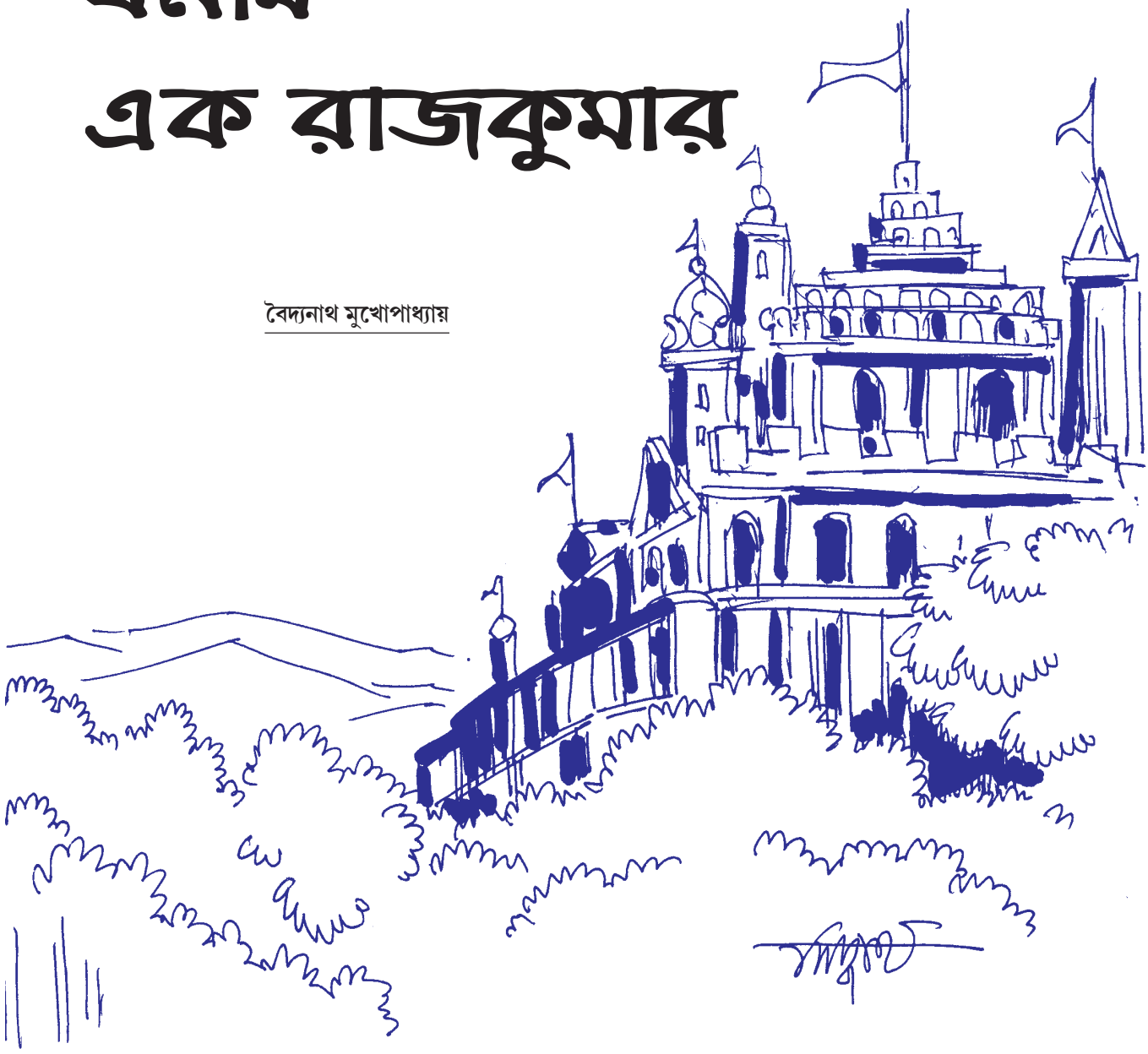

ভারত ইতিহাসে সে ছিল এক ভারি সুখের সময়। অখণ্ড এক শান্তির কাল।

ঐতিহাসিকরা এই যুগটিকে চিহ্নিত করেছেন 'গুপ্তযুগ' বলে। ইতিহাস-খ্যাত সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এ যুগটি তৈরির অন্যতম কারিগর। সমুদ্রগুপ্তকে বিদেশি ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, 'ভারতীয় নেপোলিয়ন'। তা নেপোলিয়ন তো ছিলেন সেদিনের সম্রাট। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন অনেক অনেক পুরনো। মৌর্য যুগের ঠিক পরেই তাঁর আবির্ভাব। মৌর্যযুগের ভেঙে যাওয়া খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতকে নিয়ে তিনি নিজের বাহুবলে এবং নিজের বুদ্ধির কৌশলে গড়ে তুলেছিলেন একটি বিশাল সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যটিতে মৌর্যদের কিছুটা আদল ছিল বটে, কিন্তু এ সাম্রাজ্য একেবারেই পৃথক। ভারতের ঐক্যকে সংহত করতে পেরেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত, কিন্তু তা ধর্মের মোটা রশি দিয়ে নয়। কর্ম-শক্তির বাঁধন দিয়ে।

রাজকোষের টাকা-পয়সা অশোকের মতো ধর্মের জন্য খরচ করতেন না সমুদ্রগুপ্ত। ধর্ম প্রচারের জন্য একটি কানা-কড়িও না। ইনি যা কিছু খরচ করতেন, তা পরিকল্পিত ভাবে রাজ্যের সুরক্ষায়। শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী ছুটে বেড়াত তাঁর সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নগরে-প্রান্তরে অশ্বক্ষুরধ্বনি। খাড়া থাকত তীরন্দাজ সেনার দল। মোট কথা, সমুদ্রগুপ্তের সেনাদল যে কোনও শত্রু মোকাবিলায় সক্ষম ছিল। তা সে শত্রু দেশের ভেতরে বা বাইরের যেমনই হোক না কেন।

ক্ষাত্রশক্তিতে প্রবল প্রতাপের অধিকারী হয়েও সাহিত্য-সঙ্গীত ইত্যাদি ব্যাপারে কম উৎসাহী ছিলেন না সমুদ্রগুপ্ত বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা। ওঁদের রাজসভা গম্ গম্ করত বিদ্বান এবং গুণীদের সমাবেশে। এঁদের কোনও কোনও কবি এবং গুণীদের নাম আজও ভারতবর্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর সিংহাসনে যাঁরা এসে বসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন একই ঐতিহ্যের অনুসারী। যেমন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথাই ধরা যাক। গুপ্ত রাজবংশ তৈরি হয়েছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার নরম মাটিতে। কিন্তু মজার ব্যাপার, তাঁরা ওই মাটিতেই কিন্তু আটকে থাকেননি। এঁদের রাজত্বটা বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর মালব দেশ এবং তাকে ছাড়িয়েও। যমুনা নদীর দক্ষিণ থেকে বিন্ধ্য পাহাড় পর্যন্ত যে বিশাল ভূখণ্ড, সেখানে ছিল 'বাকাটক'দের রাজত্ব। সেটাও চলে এসেছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দখলে।

চলে এসেছিল অনেক জনপদ। অনেক জনবসতি। মেলা নগর, আর বিস্তর প্রাসাদ।

পাটলিপুত্র ছিল গুপ্তরাজাদের রাজধানী। এখান থেকেই রাজ্যের বিস্তার। পরে বিস্তৃত রাজ্যের জন্য আরও একটি রাজধানীর প্রয়োজন হল। এই রাজধানীটি তৈরি হল মালবদেশের উজ্জয়িনীতে।

পশ্চিম ভারতে মালব এবং সৌরাষ্ট্রে 'শক-ক্ষত্রপা'দের দাপট ছিল খুব বেশি।

এরা কারা? কী এদের পরিচয়? এর পিছনেও একটু ইতিহাস রয়ে গেছে।

মধ্য এশিয়া থেকে শক-হানাদারেরা এসে এক সময় কাঁপিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ভূখণ্ডকে। কালক্রমে তারা ধীরে ধীরে এদেশে বসবাস করতে থাকে এবং আরও ধীরে ধীরে এখানকার মানুষদের সঙ্গে তারা মিশে যায়। ভারতীয় হয়ে যায়। হিংসাবৃত্তি ছেড়ে দেয়। কিন্তু কিছু কিছু 'শক' আলাদা ভাবে নিজেদের স্বভাব বজায় রাখে। নিজেদের হিংসাবৃত্তি ছাড়তে পারে না— ওরাই হল 'শক-ক্ষত্রপা'। ঝামেলা পাকানোই ছিল তাদের স্বভাব ও কাজ। নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শায়েস্তা করেন। এদের দমন করার জন্যই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরিচিত হয়ে গেলেন 'শকারি' অভিধায়। ওই শক শক্তিকে চূর্ণ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কেবল 'শকারি' হননি, তিনি তাঁর পরাক্রমের জন্য 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিও পান। ইনিই সেই বিক্রমাদিত্য, যাঁর সভা আলোকিত করে মহাকবি কালিদাস সহ নয়জন বিশিষ্ট প্রতিভাধর 'নবরত্ন' হয়ে উপস্থিত থাকতেন। ইতিহাস আজও এঁদের কথা ভোলেনি।

তা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমল একদিন ফুরোল। ফুরোল সগৌরবে।

তাঁর সিংহাসনে এসে বসলেন তাঁর ছেলে কুমারগুপ্ত। বাপকা বেটা কুমারগুপ্তও পরাক্রমে বাপের থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না। সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন পঁয়তাল্লিশ বছরের মতন, তা পঁয়তাল্লিশ কেন, এই রাজত্ব কাল পঞ্চাশও হতে পারে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ কিংবদন্তী বিক্রমাদিত্যও সগৌরবে রাজত্ব করে গেলেন তেত্রিশ বছর। এরপর এলেন কুমারগুপ্ত, তাঁর পিছনে রইল সু-শাসকের বিরাট এক ঐতিহ্য। এই কুমারগুপ্তও বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজত্ব করতে থাকলেন বা করে গেলেন চল্লিশ বছর ধরে। এইভাবে দেখতে দেখতে গুপ্তরাজাদের রাজত্ব গড়িয়ে গেল একশ' বছর।

কিন্তু রাজ্যশাসন করতে করতে শেষের দিকটায় একটি হোঁচট খেয়ে বসলেন রাজা কুমারগুপ্ত। রাম হোঁচট। এতে টাল খেয়ে গেল গোটা রাজ্যটাই। এ এক আশ্চর্য বৃত্তান্ত।

এই টাল খাওয়া রাজ্যটিকে সামাল দিতে এগিয়ে আসতে হল রাজকুমার স্কন্দগুপ্তকে। এই স্কন্দগুপ্ত হলেন কুমারগুপ্তের ছেলে। ইনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। অথচ ধীর শান্ত স্বভাবের মানুষ। আর ছিলেন রণকুশল। গুপ্ত রাজাদের সেনাদলের কাছে আদর্শ এক সেনাপতি।

তা সেনাপতি ইত্যাদি বলার আগে সাম্রাজ্যের চেহারাটা কেমন ছিল, তার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এবং কীভাবে তা শাসন করা হত, তারও কিছু পরিচয় জানা প্রয়োজন।

এই সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতিকে বলা হত 'মহাবলাধিপতি'। কুমার স্কন্দ সেনাপতি হলেও মহাবলাধিপতি ছিলেন না। এই পদে ছিলেন আর একজন, যিনি আরও বিচক্ষণ। বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল তাঁরই হাতে। তিনি থাকতেন মগধে, এবং বিশাল রাজপ্রাসাদের অতি নিকটে, অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং সুদক্ষ তীরন্দাজরা তাঁরই আদেশমতো চলাফেরা করত। কোথাও কোনও গোলমাল দেখা দিলে ত্বরিতে সেখানে পৌঁছে যেত।

সুরক্ষা ও সুশাসনের ব্যাপারে আরও ব্যবস্থা ছিল। এ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে 'মহাবলাধিপতি' যেমন ছিলেন সতত তৎপর, তেমনি নগর এবং পুরবাসীর দায়িত্বে সদাসতর্ক থাকতেন 'মহাপ্রতিহার'। নগরের ভেতর তস্কর এবং দুষ্কৃতীদের তিনি কঠোর হাতে দমন করতেন। 'মহাদণ্ডনায়ক' ছিলেন ফৌজদারি বিভাগের প্রধান বিচারপতি। তিনি তস্কর এবং চোর চোট্টাদের এমন সাজা দিতেন, তারা সে সাজা পেয়ে আর কখনও অপরাধ করতে সাহস পেত না। গুপ্ত-রাজত্বে 'প্রাণদণ্ড' দেওয়া হত না। অঙ্গচ্ছেদও চলত না, তাদের যে ধরনের সাজা দেওয়া হত, তাতে তারা পরে সুস্থ সামাজিক জীবনে ফিরে আসতে পারত।

গুপ্ত রাজারা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন না। তাঁরা হিন্দু ধর্মটাকেই নিজেদের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উপাস্য ছিলেন অনেক দেবতা, তবে বিশেষভাবে পছন্দ করা হত ময়ূরবাহন কার্তিককে। শিব-বিষ্ণু এবং বুদ্ধকেও এঁরা পুজো করতেন। পৌরাণিক রাজাদের মতো এঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞও করতেন। এসময় বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা, হিন্দু ধর্মাচরণের বিরোধী হলেও, নিজের নিজের মতো ধর্মাচরণ করতে পারতেন। গুপ্ত রাজারা কোনও বাধা দিতেন না।

মোটকথা, গুপ্ত রাজাদের আমলে আশ্চর্য এক শান্তি বিরাজ করত ভারতবর্ষে।

এই শান্তি কেমন ছিল, তা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য পড়লে বোঝা যায়।

এত শান্তি সত্ত্বেও কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষে হোঁচট খেল গুপ্তসাম্রাজ্য।

রাজকুমার স্কন্দ তখন পশ্চিমদেশের এক সীমান্তে অবস্থান করছেন। হিরণ্যবহা এক নদী তীরে গুপ্তদের ছিল এক চৌকি। সেই চৌকিতে বসে সাম্রাজ্যের অতন্দ্র পাহারায় অবস্থান করছেন কুমার স্কন্দ।

সেকালে সব নদীকেই বলা হত 'হিরণ্যবহা। স্বচ্ছসলিলা নদীটি প্রত্যুষের সূর্যকিরণে সোনার রঙে রাঙিয়ে উঠত। দিনের শেষে অস্তসূর্যের আলোতেও দেখা দিত এই একই চেহারা। আর সারাদিন ধরে তার রঙ হত হীরের মতো। ঝলমল করত, ঝিকিমিকি করত, বিকীর্ণ করত হীরের দ্যুতি।

ওই রকম এক 'হিরণ্যবহা' নদীর তীরে একটি অপরূপ প্রাসাদে ছিলেন তখন কুমার স্কন্দ।

চৌকিতে বসে তাঁকে নজর রাখতে হত হঠাৎ যেন কোনও আক্রমণকারী বাইরে থেকে এসে রাজ্যের ভেতর ঢুকে না পড়ে। কেননা, এক সময় শকেরা এই পথ দিয়েই ভারতে এসে দলে দলে ঢুকে পড়েছিল। কুমার স্কন্দের প্রাসাদের অদূরে ছিল 'স্কন্দবার'। সেনা নিবাস। এই স্কন্দবারে মজুত থাকত কয়েক হাজার যোদ্ধা। হঠাৎ কোনও আক্রমণ হলে, তারা তার মোকাবিলায় ছিল সক্ষম।

ওই সেনাদের শরীরচর্চা এবং তাদের অস্ত্র প্রয়োগের নিয়মিত অভ্যাস চাক্ষুষ করতে হত কুমার স্কন্দকে। চৌকিতে বসে আরেকটি দায়িত্ব পালন করতে হত কুমারকে। সে দায়িত্ব হল তোলা এবং কর আদায়। কর্মচারীরাই এটি করত, কিন্তু তার নজরদারি করতে হত। দিনের অনেকখানি সময় এই ভাবে কেটে যেত।

কুমারের বিশ্রামের সময় ছিল অপরাহ্নকাল।

অস্তসূর্যের আলোয় যখন নদীর জল সোনালি রঙে রাঙিয়ে উঠত, তখন কুমার বসে থাকতেন নদীতটে পাথরের সিঁড়িতে। ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যেত। চারদিক ঢাকা পড়ে যেত অন্ধকারে। অদূরে স্কন্দবারে একটি একটি করে জ্বলে উঠত মশালের আলো। আকাশে দেখা দিত মিটিমিটি তারা। তারকাপুঞ্জ।

কুমার স্কন্দ সেই অন্ধকারে বসে বসে ভারত-চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন।

তা সেদিনও সেইভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুমার মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ অশ্বক্ষুর-ধ্বনিতে তাঁর ভারত-চিন্তা ছিন্ন হল। প্রাসাদে তখন জ্বলে উঠেছে আলো। প্রাসাদের সামনের অঙ্গনে আলো-আঁধারি। কুমার দেখলেন, কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে ওই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গেল।

সেই আলো-আঁধারিতেও চিনতে অসুবিধা হল না,— ওই সৈনিকরা গুপ্তরাজ্যের সৈনিক।

তাদের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন কুমার।

ইতিমধ্যে প্রাসাদের পাহারাদারেরা এগিয়ে এল মশাল

নিয়ে। আঁধার কেটে প্রাঙ্গণ আলোকিত হল।

ঘোড়া থেকে নেমে সৈনিকরা কুমারকে অভিবাদন জানাল।

'তোমাদের পোশাক দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা আমাদেরই সৈনিক।'

'আপনার অনুমান সত্য, যুবরাজ। আমরা আপনাদের সাম্রাজ্যেরই সৈনিক। আমরা আসছি রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে। টানা এক সপ্তাহকাল ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি।'

'তা হঠাৎ আমার কাছে কেন? মহারাজ কুমারগুপ্ত কী অসুস্থ?'

'আঁজ্ঞে, তা বলতে পারব না, যুবরাজ। তবে তিনি দীর্ঘ এক বছর ধরে রাজপ্রাসাদের বাইরে বের হচ্ছেন না। তাঁকে নিয়ে মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা খুবই চিন্তিত। মহাবলাধিপতি উগ্রসেন রীতিমত উদ্বিগ্ন। দ্বাদশ বৎসরকাল আপনি পাটলিপুত্রে যাননি, তা সে ব্যাপারেও ওঁরা কিছুটা বিচলিত। তাই তাঁরা আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা একটি পত্র লিখেছেন আপনাকে দেবার জন্য। এই পত্রটি পাঠ করলেই জানতে পারবেন সমস্ত বৃত্তান্ত।'

'কই, সেই পত্র, দেখি!'— কুমারস্কন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে হাত বাড়ালেন চিঠিটি নেবার জন্য।

পত্রখানি হাতে নিয়ে মশালের আলোয় সেটি পড়ে ফেললেন কুমার স্কন্দ।

মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা অতি বিনীতভাবে লিখেছেন—

'মহামহিম যুবরাজ, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল আপনি রাজধানী পাটলিপুত্রে আসেননি। তাই রাজধানী পাটলিপুত্র এবং এতদ্‌সন্নিহিত রাজ্যখণ্ডের পরিচয় আপনার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত। আপনি সৌরাষ্ট্রের প্রদেশপাল হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করছেন, তা খুবই জটিল ও দুরূহ। তাই আপনার যত মনোনিবেশ সেখানে। পাটলিপুত্রে আসবার অবকাশ আপনার কম। এবং সত্যিকথা বলতে কী, এখানে আপনার প্রয়োজনও সেভাবে অনুভূত হয়নি। মহারাজ কুমারগুপ্ত স্বয়ং এতদ্‌ অঞ্চলের দেখাশোনা করছিলেন। এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই করছিলেন। কিন্তু গত দশ বছর ধরে ধীরে ধীরে মহারাজের চরিত্রে বিশেষ এক শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় রাজ্যে এবং রাজ্যপরিচালনায় বিশেষ শৈথিল্য দেখা দিয়েছে।

প্রথমে মহারাজের চরিত্রের শৈথিল্যের কথাই বলা যাক।— গত দশ বছর ধরে মহারাজ এক নবযুবতীর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এই নবযুবতীটি খুবই সুন্দরী, যৌবন-ভারে টলমল। আমাদেরই এক সেনাপতির সে দুহিতা। আমাদের এই সেনাপতির নাম মহেন্দ্রপ্রতাপ। মহেন্দ্রপ্রতাপ পাজী মানুষ। সেই সঙ্গে সে কৌশলী এবং লোভী। সে নিজের দুহিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে মহারাজের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছে। এখন সে মহারাজের শ্বশুর। সুতরাং রাজপরিবারে তার খুবই দাপট। তা রাজপরিবার কেন, রাজপরিচালনাতেও সে ইদানীং নাক গলাতে আরম্ভ করেছে। সে ধীরে ধীরে নিজের অনুগত আত্মীয় ও পরিজনদের দিয়ে প্রশাসনের অনেক জায়গা দখল করে নিয়েছে। অর্থ বিভাগে তার এখন অবাধ প্রতিপত্তি। মহারাজকে সুন্দরী যুবতীর যৌবন ও রূপমাধুর্যের নেশা ধরিয়ে তাঁর বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। মোটকথা, এইভাবে চারদিক ঘিরে এক মহাসংকট নেমে আসছে। মহারাজের অন্দরমহলে খুবই গোলমাল। পট্ট মহিষী অনন্তদেবী এবং মহিষী দৈবকী ভীষণ অশান্তিতে ভুগছেন। পরিচারিকাদের ভেতর দলাদলি। মহারাজের এ সব বিষয়ে হুঁশ নেই। তিনি অন্দরমহলে নবযুবতীকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। সকলে বলছে বিশাল রাজসংসারে ঘুণ ধরেছে। ঘুণ পোকাই গুপ্ত-সাম্রাজ্যকে কুরে কুরে খাবে।

তা কেবল ঘুণ পোকার কথা বলি কেন। ইতিমধ্যে রাজ্যটিকে শেষ করে দেবার জন্য 'হুন' পোকারাও দেখা দিয়েছে। 'হুন পোকা' বলতে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যুবরাজ, আমি কী বলতে চাইছি। এরা হল হুন দস্যুদল। হুন সর্দার তোরমান এবং মিহিরকুল অতি সন্তর্পণে রাজ্যের নানান জায়গায় সুদক্ষ হুন সেনাদের অতি কৌশলে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। হুনরা কিছুদিনের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তারা এখন নানা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে শুরু করেছে। জঙ্গলের ভেতর, নির্জন প্রান্তরে এবং জনবসতিহীন পাহাড়ের সানুদেশে এরা ছাউনি ফেলে বসে পড়েছে। অপেক্ষা করছে, সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগ পেলে এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরা দেখতে খর্বকায়। স্থূল দেহ। দাড়ি গোঁফহীন। পেঁচার মতো চোখ। পীতবর্ণ। এদের দেখলে সকলে আতঙ্কিত হয়। অনেক সাহসী লোকেরাও এদের দেখলে কাঁপতে শুরু করে। এরা কাপড়ের পোশাক পরে না। পরে পশুচামড়ার পোশাক। এরা তীরন্দাজীতে খুবই দক্ষ। এরা পোকার মত অসংখ্য। এদের বিনাশ করা কঠিন। এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, এদের হাত থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। রাজ্যটি চলে যাবে হুন সর্দার তোরমানের হাতে।

এখন হুনদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে কে?— রাজা স্বয়ং রমণীরূপে মজে বেহুঁশ হয়ে বসে আছেন অন্তঃপুরে। তিনি কোনও আদেশ দিতে পারছেন না, 'মহাবলাধিপতি' বসে আছেন অকেজো হয়ে। ছাউনিতে সেনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকলেও তাদের পরিচালনা করে যুদ্ধে নিয়ে যাবার জন্য যোগ্য সেনাপতি কোথায়? মহারাজের অনুমতি ছাড়া সেনাপতি নির্বাচন সম্ভব নয়। এদিকে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহারাজের নতুন শ্বশুর মহেন্দ্রপ্রতাপ। তাঁকে টপ্‌কে কোনও

কাজ করা সম্ভব নয়। — আমি মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা এই পরিপ্রেক্ষিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অবস্থায় কোনও পথ না পেয়ে যুবরাজ, আমি আপনাকে শীঘ্র রাজধানী পাটলিপুত্রে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার ধারণা, এই সংকট থেকে রাজ্যটিকে আপনিই পারবেন মুক্ত করতে।

ইতি— মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা

পুনশ্চ ঃ আমরা আপনার অপেক্ষায় রইলাম।

এই চিঠিখানি পড়বার পর কুমার স্কন্দগুপ্ত কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। যে সব অশ্বারোহী সৈনিক পাটলিপুত্র থেকে এসেছিল, তাদের বললেন, 'তোমারা আজ রাত্রে বিশ্রাম নাও। তোমাদের সঙ্গে কাল প্রত্যুষেই আমি রাজধানী পাটলিপুত্র রওনা দেব।'

রাতে ভালো ঘুম হল না। কুমার স্কন্দ শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু তা শুধুই শুয়ে থাকা। তাঁর চোখের সামনে সাম্রাজ্যকে ঘিরে নানান স্মৃতি ঘুরে বেড়াতে থাকল। যেন জাগ্রত স্বপ্নচিত্র।

রাজপ্রাসাদের কোনও ঘটনা কোনওদিনই কুমার স্কন্দকে পীড়িত করেনি। আঘাত করেনি। মোটকথা, এসব নিয়ে কোনওদিন তিনি মাথা ঘামাননি। পিতৃদেব কুমারগুপ্ত যেভাবে এবং যেমন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, পুত্র হিসেবে কুমার স্কন্দ সেইভাবে এবং তেমনভাবেই রাজার সহায়তা করে গেছেন। অন্তঃপুরে পিতৃদেব কুমার গুপ্তের কয়টি রাণী আছে, তা নিয়ে কখনও খোঁজ খবর নেননি কুমার স্কন্দ। কখনও মাথা ঘামাননি। রাজা কুমার গুপ্তের ওপর রাণীদের কোনও প্রভাব আছে কী না, তাও কখনও খতিয়ে দেখেননি। আসলে পিতৃদেব রাজা কুমারগুপ্তকে প্রভাবিত করে, এমন কোনও রাণী সেদিন ছিল না। রাজা রাজ্যশাসন করতেন, ব্যস্ত থাকতেন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, ব্যস্ত থাকতেন রাজ্যকে নির্বিঘ্ন করতে। রাজার অন্তঃপুর কখনও তাঁর ওইসব কাজে বাধা হয়ে দেখা দিত না। রাজা অন্তঃপুরে যেতেন দু'দণ্ড শান্তি পেতে। ব্যস, এই পর্যন্ত।

রাজা কুমারগুপ্তের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের সংহতি রক্ষায় কুমার স্কন্দ কখনও দৌড়ে বেড়িয়েছেন পাটলিপুত্র থেকে মধুরা, সেখান থেকে উজ্জয়িনী, আবার সেখান থেকে পশ্চিমের সাগরতীরে উপকূলে, বন্দরে। নির্বিঘ্নে সব কিছু চলছে কী না, তা তিনি দেখে বেড়িয়েছেন।

না, কোনও গোলমাল তাঁর চোখে পড়েনি। শেষে এই বারো বছর হিরণ্যবহা নদীতীরে প্রায় স্থায়ীভাবে থিতু হয়ে গেছেন কুমার স্কন্দ। পাটলিপুত্রে আর তেমন যাওয়া হয় না। তবে পাটলিপুত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন নয়। এখানকার খবর সেখানে যায়। আর ওখানকার খবর এখানে চলে আসে। তা এসব খবরাখবরে রাজপুরের খবর থাকে না। রাজার অন্দরমহলের খবর একেবারেই নয়। সুতরাং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাজকুমার গুপ্ত যে এক তরুণী রূপসীর মোহে বুঁদ হয়ে রাজ্য শাসনে অমনোযোগী, তা কুমার স্কন্দ জানেন না।

এরপরে রয়েছে হুন-কীটদের কথা।

কুমার স্কন্দ এই হিরণ্যবহা নদীর তীরে বসে হুনদের আক্রমণ তেমনভাবে টের পাচ্ছেন না। এক সময় তারা এই ভারত ভূখণ্ডে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই পর্যন্ত। তারা গুপ্ত রাজাদের কাছে বেদম মার খেয়ে মধ্য এশিয়ায় নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়। সে সময় হুন সর্দার তোরমান আর তার শাগরেদ মিহিরকুল যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, তার ছবি আজও চোখের সামনে ভাসে কুমার স্কন্দ-র।

এখন দেখা যাচ্ছে, তারা মার খেয়ে চম্পট দিলেও ভারতের সম্পদের লোভ ছাড়তে পারেনি।

বোঝা যাচ্ছে, তারা নতুন কৌশল নিয়ে দেশের ভেতর অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। এই কৌশল দেখে মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা তাদের সর্বনাশ কীটদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঘুণ পোকা নয়, তারা যেন হুন পোকা। হুন কীট।

কুমার স্কন্দের মনে হল, এই কীট সর্বনাশা। কাঠকে যেভাবে ঘুণ পোকা ধীরে ধীরে অজস্র গর্ত করে ফাঁপা করে ছেড়ে দেয়, এই হুন পোকাও গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ক্ষীণ-দুর্বল করে দেবে। তারপর ওরা গোটা ভারতভূমিকে দুর্বল করে দলবল নিয়ে এসে চেপে বসবে। কর্পূরের মতো উবে যাবে ভারত। উবে যাবে এতদিন ধরে গড়ে তোলা গুপ্তসাম্রাজ্য। হারিয়ে যাবে সমুদ্রগুপ্তের নাম, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হয়ে যাবেন ইতিহাস এবং পিতৃদেব কুমার গুপ্তের সব যশ গৌরব কালো আঁধারে ঢেকে যাবে।

সারা রাত ধরে কুমার স্কন্দগুপ্তকে এই ভয়ঙ্কর ভাবনা ঘুমোতে দিল না। বিভীষিকা হয়ে তাঁকে জাগিয়ে রাখল। কুমার স্কন্দ কখনও দুঃসহ চিন্তায় শয্যা ছেড়ে পায়চারি করতে থাকলেন শয়নকক্ষে। কখনও অলিন্দে বের হয়ে এসে নিশীথ রাতে দেখতে থাকলেন হিরণ্যবহা নদীটিকে। চারদিক শুনশান। মাঝে মাঝে রাতচরা পাখিদের ডাক শোনা যেতে থাকল।

তা ধীরে ধীরে এক সময় পুবের আকাশে রঙিন আভা দেখা দিল।

না, কুমার স্কন্দ আর বিলম্ব করলেন না।

পাটলিপুত্র থেকে আসা অশ্বারোহীদের সঙ্গে নিজেদের অশ্বশালার থেকে আরও শ' দুই অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কুমার স্কন্দ রওনা দিলেন পাটলিপুত্রের দিকে।

যেমন অনুমান করা গিয়েছিল, সেই রকমই সময় লাগল।

টানা এক সপ্তাহকাল অশ্ব চালিয়ে, রাজধানী পাটলিপুত্রে এসে পৌঁছালেন, তখন এক প্রহর বেলা। দীর্ঘ বারো বছর আগে যেমন পাটলিপুত্রকে যুবরাজ স্কন্দ দেখে গিয়েছিলেন, রাজধানীটি ঠিক সেই রকমই রয়েছে। প্রশস্ত রাজপথের ধারে ধারে সারি সারি দোকান। বৈশ্য ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্য বিক্রয় করছেন। ক্রেতারা বারো বছর আগে যেভাবে ভিড় করে পণ্য সওদা করত, এখনও সেই ভাবে তাঁরা পণ্য ক্রয় করছেন। সেই একই চিত্র। কোনও হেরফের নেই।

রাজপথ ধরে বীরদর্পে চলেছেন রাজপুরুষেরা। ঠিক আগের মতোই। কেউ পদব্রজে, কেউ অশ্বারোহণে।

দূর দেশের পথিকরা চলেছেন হাঁটতে হাঁটতে। ক্লান্ত পদে, মন্থর গতিতে।

পথের ধারে ধারে সারি সারি গাছ। গাছে গাছে বাসা বাঁধছে পাখিরা। পাখিদের কলরবে গাছগুলি মুখর। পথের ধারে ধারে কোথাও কোথাও রাজ-উদ্যান। প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা উদ্যানগুলি। বারো বছর আগে যেমন ছিল। ঠিক তেমনই রয়েছে। নগর এবং পুরনগরের দায়িত্বে থাকা মহাপ্রতিহারের কাজের প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না যুবরাজ কুমার স্কন্দ। সব ঠিকই আছে।

ওইসব চারদিক দেখতে দেখতে যুবরাজ স্কন্দ যথা সময়ে এসে পৌঁছালেন পাটলিপুত্র রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে। তোরণের পাহারায় যে সব প্রহরীরা ছিল, তারা দৌড়ে এল।

তরুণ এক প্রহরী নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করল, 'কে আপনি ভদ্র? আপনি রাজপ্রাসাদে ঢুকতে চলেছেন কার অনুমতিতে?'

যুবরাজ অশ্বটি থামিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার জন্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশে কোনও অনুমতির দরকার হয় না। বরং আমিই অনুমতি দেব। আমি যুবরাজ স্কন্দ।'

'ভদ্র, আপনার এই অশ্বারোহী সৈনিকরাও কী আপনার সঙ্গে এই ভাবে প্রাসাদে প্রবেশ করবে?'

'হ্যাঁ।'

প্রহরীটি মাথা চুলকোতে থাকল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভেবে পাচ্ছে না, কী এখন করবে।

তা সেই সময় পিছন থেকে হঠাৎ এগিয়ে এল প্রহরী দলের এক বয়স্ক পাহারাদার। সে তরুণ পাহারাদারদের পাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যুবরাজ কুমার, ওরা নতুন লোক। আপনাকে চিনতে পারেনি। এদের অজ্ঞতাকে মার্জনা করবেন। দীর্ঘ কয়েক বছর পরে আপনি রাজধানীতে এসেছেন, তাই ওদের এমন বিভ্রান্তি।' এরপর সেই বয়স্ক লোকটি তরুণ পাহারাদারদের বলল, 'তোরা যুবরাজের কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর। নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নে। তারপর ওঁকে ওঁর মহল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়।'

মুহূর্তে পরিস্থিতিটি বদলে গেল। শুরু হল রাজকীয় খাতির।

রাজকুমার স্কন্দকে পাহারাদারেরা তাঁর মহলে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। অশ্বারোহীদের নিয়ে যাওয়া হল স্কন্দবারে। অশ্বগুলিকে রাখা হল অশ্বশালায়।

যুবরাজ স্কন্দ নিজের মহলে বসে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিলেন। না, এখন বিশ্রাম নেবার সময় নয়। এখনই কাজ শুরু করে দেওয়া দরকার। যুবরাজের মহলে যে পরিচারকটা তাঁর দেখভাল করছিল, তাকে তিনি বললেন, 'দ্যাখো বাপু, তোমাকে এখনই মহারাজ কুমার গুপ্তের কাছে যেতে হবে। তাঁর মহলে গিয়ে বলো, যুবরাজ স্কন্দ এসেছেন সৌরাষ্ট্রের হিরণ্যবহা নদী তীরের প্রাসাদ থেকে। এই যুবরাজ এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। খুবই দরকার আছে।'

পরিচারকটি চলে গেল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে সে ফিরে এল। ফিরে এসে বিষণ্ণমুখে বলল, 'যুবরাজ, মহারাজ কুমার গুপ্ত এখন খুবই ব্যস্ত রয়েছেন। মহল থেকে বের হতে পারবেন না। তাই দেখা হবে না।'

যুবরাজ স্কন্দ যার আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই হল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে বসলেন, মহারাজের কী আশ্চর্য পরিবর্তন! যে স্কন্দকে তিনি দূর থেকে দেখলে দৌড়ে আসতেন, যার কণ্ঠস্বর শুনে ব্যাকুল হতেন, সেই মানুষটি আজ নির্বিকার। মোটকথা, মহামন্ত্রী তাঁর চিঠিতে যা যা লিখেছিলেন, তার হুবহু অভিজ্ঞতা তাঁর হল। — রাজ্যে যখন সমূহ বিপদ, তখন মহারাজের এই নির্বিকার নির্লিপ্ততাকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রতিকার একটা দরকার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে যুবরাজ এবার ডেকে পাঠালেন মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মাকে।

আহ্বান পেয়ে তড়িঘড়ি এসে হাজির হলেন মহামন্ত্রী।

'মহামন্ত্রী, আমি তো এসে গিয়েছি। কিন্তু এখন আমি কী করব? আমি হুন দস্যুদের দমনে এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি। এই দস্যুরা ঠিক কোথায় কোথায় রয়েছে, আপনি তার বিবরণ দিন। কালবিলম্ব না করে আমাদের সুশিক্ষিত সেনাদের নিয়ে কাল প্রত্যুষেই তাদের আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে যেতে পারি।'

‘যুবরাজের এই উৎসাহ দেখে আমি অভিভূত। আমি ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম। কিন্তু হুন দস্যুদের দমন করার ব্যাপারে কিছু রাজকীয় নির্দেশের প্রয়োজন আছে।’

‘রাজকীয় নির্দেশের প্রয়োজন? সে আবার কী!’

মহামন্ত্রী মৃদু হেসে বললেন, ‘গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে সব নিয়ম-পন্থা রয়েছে আমি তার কথা বলছি।’

‘বলুন কী নিয়ম-কানুন।’— কুমার স্কন্দ কী নিয়ম-কানুন, তা জানার জন্য ব্যাকুল হলেন।

মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা জানালেন, গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিয়মে ‘রাজা’ই হলেন তাঁর বিপুল সাম্রাজ্যের প্রধান। তাঁর হুকুম বা নির্দেশেই সব কিছু চলে। মহারাজের হুকুমেই এই বিনায়ক শর্মা আজ মহামন্ত্রী। যিনি সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন, সেই ‘মহাবলাধিপতি’ও মহারাজের নির্দেশে নিজের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। — যুবরাজ ও রাজকুমাররা যে বিভিন্ন প্রদেশে শাসক হিসাবে নিযুক্ত, সেও তাঁর নির্দেশ এবং মহারাজের হুকুমনামার বলে। এটাই গুপ্ত রাজাদের রাজ্যশাসনের বিধি।’

‘বেশ ত, তা এখানে সমস্যাটি কিসের?’

‘সমস্যা! না সমস্যা কিছুই না— তবে এখন প্রশাসন স্থবির। অচল। তাই সমস্যা। হুন দস্যুদের দমনের কাজে কাকে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেই স্বাক্ষরটি দেবেন মহারাজা। তাহলেই স্থবির প্রশাসন সচল হয়ে উঠবে।’

‘তা মহারাজ কী বলছেন? তিনি নির্দেশনামায় স্বাক্ষর দেবেন না?’

‘হয়ত দেবেন। কিন্তু তার কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না।’

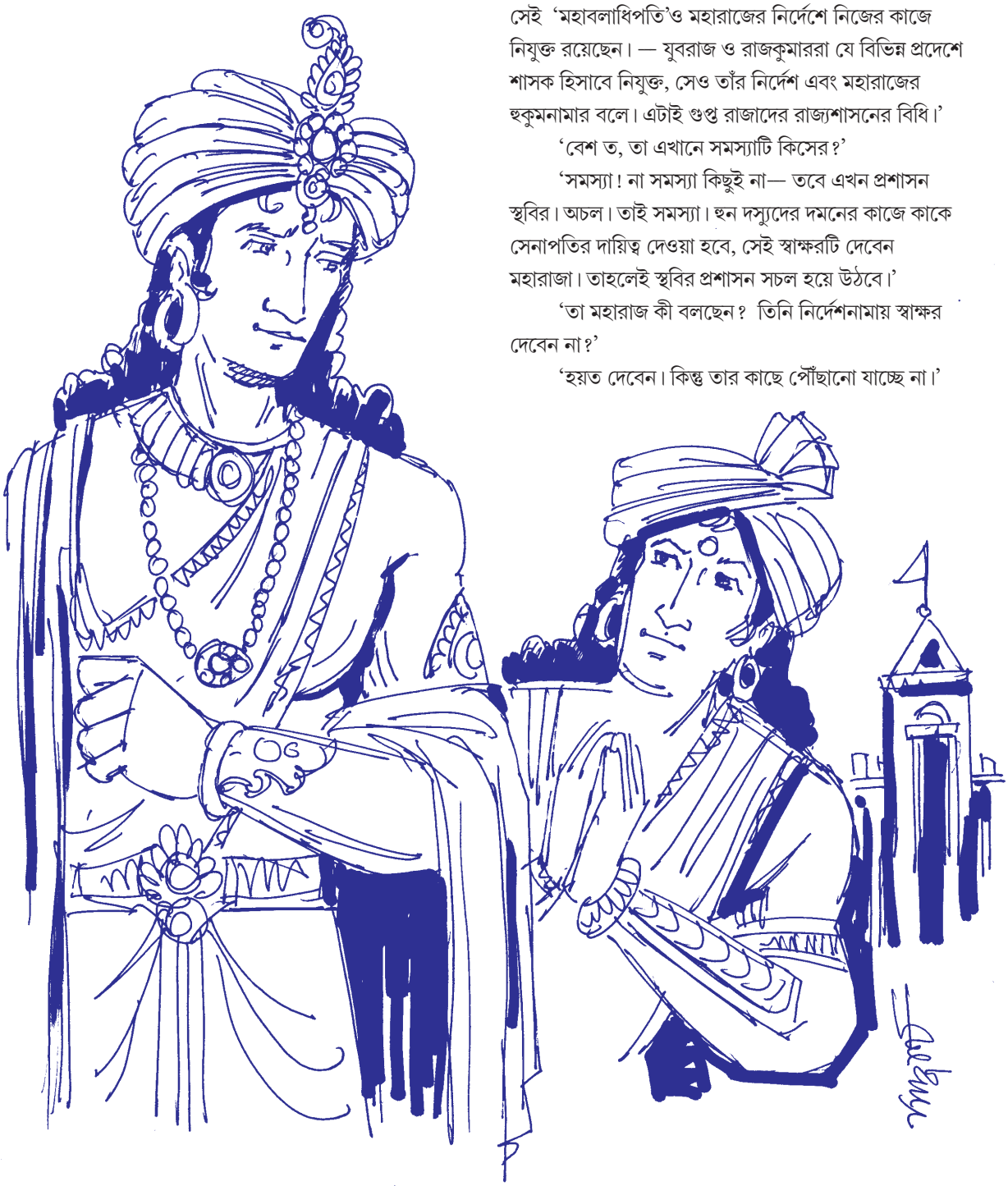

ওই পর্যন্ত বলে নীরব হয়ে গেলেন মহামন্ত্রী বিনায়ক শর্মা।

যুবরাজ স্কন্দ গুপ্ত বলে উঠলেন, 'তা মহারাজ কুমার গুপ্তর কাছে যখন পৌঁছানো যাচ্ছে না, তখন তাঁকে পাশ কাটিয়ে সাম্রাজ্যের সেনাপতি 'মহাবলাধিপতি'কে নিয়ে যদি আমরা হুন বিতাড়নের কাজ শুরু করে দিই, তাতে অসুবিধা কী!'

মৃদু হাসলেন মহামন্ত্রী।

বললেন, 'প্রস্তাবটি মন্দ নয়। তবে আমরা সকলেই নিয়মের দাস। সেনাপতি 'মহাবলাধিপতি' এই প্রস্তাবে রাজি হবেন না। রাজ্য প্রশাসনে সংকট দেখা দিতে পারে।'

যুবরাজ স্কন্দ গুপ্ত ভাবতেও পারেননি, এই রকম একটি সংকটের মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে।

তাঁর সকল উদ্যম, সব উৎসাহ থমকে গেল। লড়াই করার আগেই তিনি যেন হেরে বসলেন। এবং শেষে বুঝলেন, যেভাবেই হোক মহারাজের মুখোমুখি তাঁকে হতে হবে।

কিন্তু তা কী ভাবে হবে? কেমন করে?

মহারাজা কুমার গুপ্তর সঙ্গে দেখা করার জন্য যুবরাজ রোজই দু'বেলা তাঁর পরিচারককে পাঠান রাজার মহলে। এবং বেচারা পরিচারক প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে।

যুবরাজ স্কন্দ হতাশ হয়ে কখনও পায়চারি করেন, কখনও শয়নকক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়েন শয্যায়।

এই ভাবে দিন তিন-চার কেটে গেল। শেষে একদিন হতাশ হয়ে নেবে এলেন কুমার স্কন্দ নীচের বাগানে। সুন্দর সাজানো বাগিচা। মেলা ফুল ফুটে আছে। ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন। সুন্দর পরিবেশ।

কিন্তু কিছুই তাঁর ভালো লাগছে না। অন্যমনা হয়ে বাগিচায় পায়চারি করতে থাকেন।

তা সেই সময় হঠাৎ একটি পুরুষকণ্ঠে কুমার স্কন্দের আনমনা ভাবটি কেটে গেল।

'যুবরাজ, আপনি যেন খুব চিন্তিত, ডুবে রয়েছেন চিন্তার সরোবরে। তা কী আপনার সমস্যা যুবরাজ? আমি কী কোনও সাহায্য করতে পারি?'

হঠাৎ এবং আকস্মিক এই পুরুষ কণ্ঠে যুবরাজ কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কে তুমি? হঠাৎ তুমি এখানে এসে ঢুকে পড়লে কী করে?'

'কী করে ঢুকলাম, তা পরে বলছি। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো, আমাকে চিনতে পারেন কিনা!'

যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত মুখোমুখি দাঁড়ালেন পুরুষটির সামনে।

পুরুষটির চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। গায়ে পাহারাদারদের পোশাক। চোখ দুটি বড়ো বড়ো এবং যেন সদা সতর্ক। মুখে চাপা হাসি। সামনের দাঁতদুটি এগিয়ে এসে তলাকার ঠোঁটদুটি চেপে রয়েছে।

লোকটিকে কিছুটা চেনা চেনা লাগল।

'কে তুমি? মুখটা কোথায় যেন দেখেছি। নাম কী তোমার?'

'আজ্ঞে, নাম আমার একটি আছে, যুবরাজ। কিন্তু সে নামে আমাকে চিনবেন না। আপনি যখন রাজপুরীর তোরণদ্বারে আটকে পড়েছিলেন, পাহারাদারেরা আপনাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না, তখন আমিই আপনাকে চিনে ফেলি। তারপর পৌঁছে দিয়ে গেলাম আপনাকে আপনার মহলে, এবার নিশ্চয় চিনতে পারছেন, এই অধম দাসের নাম, চোর রতন।'

এবার লোকটিকে চিনতে পারলেন যুবরাজ স্কন্দ।

'চোর রতন? এ আবার কী রকম নাম? গোকুল বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে 'ননী চোর' বলা হত। সে রকম কোনও রহস্য আছে না কি! চোর রতন কী কারও নাম হয়?'

'আজ্ঞে, তা হয় না। আমার আসল নাম রতন। চৌর্যবৃত্তিতে হাত পাকিয়ে এই পাটলিপুত্রে এক সেরা চোর হয়ে গিয়েছিলাম। এতটাই সেরা চোর হয়েছিলাম যে, পুররক্ষার দায়িত্বে থাকা মহাপ্রতীহারের রাতের ঘুম এই রতন কেড়ে নিয়েছিল। তা চোরেদের জীবনে সব রাত সমান যায় না। এক গভীর নিঝুম রাতে রাজবাড়িতে চুরি করতে এসে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলাম। এই নগরের প্রধান বিচারপতি 'মহাদণ্ডনায়কে'র দরবারে এই অধম রতনকে মহাপ্রতীহার হাজির করে দিলেন। তিনদিন ধরে এই রতনের বিচার চলল। শেষে দোষী সাব্যস্ত হলাম। 'সেরা চোরের' দাগ লাগল নামে। তা আমার যা দোষ ছিল, তাতে আমার দুটি হাত কেটে দেওয়ার আদেশ হওয়ার কথা। কিন্তু মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যের যে বিধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ। চোরচোট্টাদের ভালো হবার সুযোগ দেওয়াই ছিল রাজকীয় বিধান। সেই বিধান মোতাবেক ছাড়া পেয়ে গেলাম। কিন্তু 'মহাদণ্ডনায়ক' মশাই শুধু শুধু ছেড়ে দিলেন না। তিনি একটি মুচলেকা নিলেন এই রতনের কাছ থেকে, আর রতন নামের আগে 'চোর' উপাধিটি দেগে দিলেন। সেই থেকে আমি পাকাপাকি ভাবে সরকারি নথিতে 'চোর রতন' হয়ে গেলাম।'

চোর রতন ঘ্যান ঘ্যান করে তার আত্মচরিত বলে গেল। তার চরিত কাহিনী শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যুবরাজ কুমার গুপ্ত বলে উঠলেন, 'রতন, তোমার আত্মকথা আর বলতে হবে

না। থামাও।'

'তা আজ্ঞে থামলুম। আমি এতসব কথা বলে গেলাম, যদি এসব শুনে আপনি আমাকে কোনও কাজে লাগান।'

'যে কাজ নিয়ে আমি দিনরাত চিন্তা করছি, সে কাজ খুবই দুঃসাধ্য। সে কাজে তুমি কী করতে পারবে? আমার মনে হয়, আমার কাজের কথা তোমাকে না বলাই ভালো। তোমাকে বলা বৃথা।'

'আঁজ্ঞে, তাই হয়ত হবে। তবে কী না শোনা যায় এক কাঠবেড়াল অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রকে সমুদ্রের বুকে সেতু বাঁধতে সাহায্য করেছিল। তা এই চোর রতন যুবরাজকে সেইভাবে সাহায্য করতে পারে কী না, পরখ করে দেখবেন না!'

যুবরাজ চোর রতনের কথায় ভারি বিরক্ত হলেন। এবং বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি মহারাজ কুমার গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে মুখোমুখি কিছু কথা বলতে চাই। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না। পাহারাদারেরা আমাকে আটকে দিচ্ছে। কী বিপদেই না পড়েছি। দেখা করাটা খুবই জরুরি। তুমি কি পারবে, মহারাজের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে।?'

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে এলোমেলো আঙুল চালাতে চালাতে চোর রতন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'পারব।'

'তুমি এই অসাধ্য কাজটি পারবে!'

'পারব। মহারাজের নতুন রাণীর বাপ মহেন্দ্রপ্রতাপ এক কাণ্ড করে রাজার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না। মহলের দরজায় পাহারা বসিয়ে এই গোলমাল পাকিয়ে বসে আছে। মহামন্ত্রী মশাইও ভেতরে যেতে পারছেন না। এই মহেন্দ্রপ্রতাপটা মহা ঠক।'

'তুমি যা বলছ, তা ঠিক। কিন্তু বাবা চোর রতন, তুমি এই পাহারাদারদের সঙ্গে লড়াই করে আমাকে কীভাবে রাজার কাছে নিয়ে যাবে? কী ভাবে দেখা করবে?'

'আঁজ্ঞে, চোরের ওপর যেমন বাটপাড় থাকে, আমি ঠিক তেমন। এই রাজপুরীর প্রতিটি মহল এই চোর রতনের কাছে হাতের রেখার মতো জানা। এই রাজপুরীর অলিগলি, অলিন্দ, যাতায়াত, দরজা, গোপন সুড়ঙ্গ পথ— কিছুই অজানা নয় এই চোরের কাছে। রাজা মশাইয়ের গোপন ধনভাণ্ডার কোথায় আছে, তাও এই অধম জানে। যে গোপনপথে রাজার কক্ষে গিয়ে পৌঁছানো যায়, সেই পথ ধরেই আপনাকে নিয়ে যাবো। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আর তার পাহারাদারেরা বাইরেই বসে থাকবে। কিছুই টের পাবে না।'

'কী বলছ তুমি রতন! এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

'আঁজ্ঞে, অবিশ্বাস্য কাণ্ড যদি করতে না পারি, তাহলে আমি চোর রতন কিসের?'

তা চোর রতন তার অসাধারণ যোগ্যতা শেষপর্যন্ত দেখিয়েই ছাড়ল।

তখন রাত্তির। তবে এ রাত নিশুতি নয়। বা গভীর নিঝুমও নয়।

চোর রতন এসে হাজির হল যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের শয়নকক্ষে। যুবরাজ জানতেন যে রতন আসবে। তিনি তারই প্রতীক্ষায় ঘরে পায়চারি করছিলেন। মাঝে মাঝে দেখছিলেন আধোঘুমন্ত রাজধানী পাটলিপুত্রকে— আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল না। ছিল রাশি রাশি তারকা। তারকাপুঞ্জ। ছায়াপথ। আশপাশে সেই অন্ধকার রাতে সারি সারি রাজধানীর প্রাসাদ। যেন কালো চাদর গায়ে সব পাথুরে পাহারাদার। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

রতন সরাসরি ঘরে চলে এল। চলে এল নিঃশব্দে।

'চলুন যুবরাজ, এখনই সঠিক সময়। আমরা গোপন সংকীর্ণ এক গলিপথ দিয়ে মহারাজের কক্ষে চলে যাবো। এপথে কোনও পাহারাদার নেই। যা আছে, তা হল বিস্তর মাকড়সার জাল, অনেক ময়লা ধুলো। হয়ত দু-চারটা চামচিকাও থাকতে পারে। আর কিছু না।'

তা চোর রতনের চোরা পথ ধরে রতনের পিছু পিছু যুবরাজ স্কন্দ গুপ্তকে হাঁটতে হল।

এবং শেষে সত্যিসত্যিই এসে পৌঁছানো গেল মহারাজ কুমারগুপ্তের শয়নকক্ষে। আগাম সংবাদ দেওয়া হয়নি। তাই আসতে হল প্রায় চোরেরই মতন।

বিশাল কক্ষ। চারদিকে রাজকীয় বৈভব ও ঐশ্বর্য। দীপদণ্ডে সুবর্ণ প্রদীপ। একটি দণ্ড নয়, অনেকগুলি। মাঝে সুবর্ণ পালঙ্ক। সেই পালঙ্কে ঘুমিয়ে রয়েছেন এক সুন্দরী যুবতী।

মেঝেতে কোমল গালিচা। সেই গালিচায় মহারাজ বসে। সামনে পুষ্পাধার। যেখান থেকে একটি একটি করে পুষ্প নিয়ে মহারাজ একটি মালা গাঁথছেন। সেই মালা গাঁথাতে রাজা এতখানিই বিভোর যে তিনি টের পেলেন না যুবরাজ স্কন্দ এবং চোর রতন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজা নয়, সুবর্ণ পালঙ্কে যিনি ঘুমিয়েছিলেন, সেই সুন্দরী যুবতীই প্রথম টের পেলেন। তিনি নড়ে বসলেন।

বুঝতে অসুবিধা হল না, ইনিই সেই রাণী। যিনি তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দিয়ে মহারাজ কুমারগুপ্তের সমস্ত এবং সমগ্র

চেতনাকে গিলে খেয়ে নিয়েছেন। এঁরই দুরন্ত প্রভাবে রাজকর্তব্যকে বছরের পর বছর অবহেলা করে, অন্দরমহলে রাজা ঢুকে বসে আছেন। এই রাজপুরীতে সুন্দরী যুবতীদের অভাব নেই। রাজকন্যা ও রাণীরা ত বটেই, পাটলিপুত্রের রাজপুরীতে পরিচারিকারা পর্যন্ত এক একটা রূপের ডালি। কিন্তু রাজার এই নবীনা রাণীটি সকলকেই ছাপিয়ে গেছেন। ইনি যেন সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্য এক সৃষ্টি।

নবীনা রাণীকে দেখে কুমার স্কন্দ কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেলেন। এই রমণী যেন উজ্জয়িনীর কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য থেকে উঠে আসা নায়িকা। যুবরাজ এবং চোর রতনকে দেখে সুবর্ণ পালঙ্ক থেকে চকিত দৃষ্টি হেনে নবীনা রাণী কক্ষান্তরে চলে গেলেন। তাঁর শিথিল অঞ্চল ভূমিতে লুটোতে থাকল। তাঁর চলাচলে বোঝা গেল শ্রোণীভারে তাঁর গমন কিঞ্চিৎ অলস, স্তনভারে রাণী স্তোকনম্রা। এলায়িত কেশে নিঃশব্দ তরঙ্গ-ভঙ্গ।

নবীনা রাণী উঠে যেতেই রাজার চেতনা ফিরল।

তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন যুবরাজ স্কন্দকে। চোর রতন অতি দ্রুত গা ঢাকা দিয়েছে কক্ষসজ্জার আড়ালে। তাই তাকে রাজা দেখতে পেলেন না।

'যুবরাজ স্কন্দ, কী আশ্চর্য, তুমি এই রাতে কোথা থেকে এলে?'

বাবাকে প্রণাম করে স্কন্দ বললেন, 'এই রাতে হঠাৎ আমি আসিনি মহারাজ! আমি মহামন্ত্রীর আহ্বান পেয়ে সপ্তাহকাল আগেই পাটলিপুত্রে এসে হাজির হয়েছি। আপনার ডাক পাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'বটে! তা এসব বিষয়ে ত আমি কিছুই জানি না। মহামন্ত্রী আমাকে কিছুই জানাননি। কেন জানাননি, জানি না। তা হঠাৎ তোমাকে মহামন্ত্রী তলব করলেন কেন?'

যুবরাজ স্কন্দ মাথা চুলকে বললেন, 'আমাদের রাজ্য ভয়ঙ্কর এক বিপদে পড়েছে। তাই তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'বিপদ!? কিসের বিপদ?'

'হুন দস্যুরা আমাদের দেশে ঢুকে পড়েছে। বনজঙ্গল পেরিয়ে কোনও কোনও জনপদে তারা নিঃশব্দে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। এই ভাবে ঢুকে পড়ে একদিন তারা হঠাৎ রাজ্যটিকে গিলে ফেলবে।'

'আশ্চর্য! হুন দস্যুদের আমি সেই কবে তাড়িয়ে দিয়েছি। তোরমান আর মিহিরকুলের মতো দস্যুদের হটিয়ে চীন দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা আর কখনও এরাজ্যে ঢুকতে পারবে না— দেশে এখন পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।'

'বাহ্যত শান্তি রয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরেছে। ঘুণ পোকায় আমাদের রাজ্য জর্জরিত।'

'সৌরাষ্ট্র আর মালবেও এরকম দশা নাকি?'

'সবটা নয়। তবে হুনরা ধীরে ধীরে ঘুণ পোকার মতো ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

'হুম্', গম্ভীর হয়ে গেলেন রাজা। তাঁর মালা গাঁথাটা থামালেন। 'তা হলে ত ব্যাপারটি খুবই চিন্তার। এখনই সেনা নিয়োগ করে হুন দস্যুদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। কিন্তু তাড়াবে কে? সেও অনেক হাঙ্গামা।'

'হ্যাঁ। এই হাঙ্গামা থেকে দেশকে বাঁচাতে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে।'

'আমি! না-না, ওসব আমি পারব না।'

'তা হলে এ কাজ কে করবে? কে পারবে?'

'তাই ত! কে করবে, কে পারবে!'

'আপনি না পারলে, না করলে, আর কারোকে দায়িত্ব দিন।'

'এ যুক্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু কাকে দায়িত্ব দেব! আমাদের সেনাবাহিনী আছে, সেনাপতি আছে, পরামর্শ দেবার জন্য মহামন্ত্রী আছেন, একটা পরামর্শ দরকার।'

'তা আপনি করতে পারেন। কিন্তু যা করবেন তা তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'অবশ্যই।'— মহারাজা নত মুখে আবার মালা গাঁথা শুরু করলেন।— 'আমি শীগ্‌গিরই সভা ডাকছি। সেখানেই একটি সিদ্ধান্ত নেব।'

'কিন্তু সে সভা কবে ডাকবেন? সময় যে চলে যাচ্ছে।'

'তা ঠিক।'— রাজা খানিক চিন্তা করে বললেন, 'দ্যাখো, ইদানীং আমার সময় খুবই কম। তোমাদের রাণী মা-কে ফুলের আভরণে সাজাতে আমার অনেক সময় চলে যায়। প্রতিটি কাজ আমি নিজে করি। তা ছাড়া রাণীকে ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও আমি আলাদা থাকতে পারি না, রাণীও ঠিক তাই, আমাকে ছাড়া একা একা থাকতে পারে না। এইভাবেই সময় কেটে যায়। আমার কোনও অবকাশ নেই।'

'এইভাবে রাজার কী সময় কাটানো চলে?'

'না, তা চলে না। যাই হোক, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি।'

রাজার মুখে এই কথা শুনে যুবরাজ স্কন্দকে সে রাতে রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

চোর রতন তাঁকে সেই গোপন চোরাপথ দিয়ে কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে এল।

পরেরদিন সকালে কুমার স্কন্দ মহামন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। রাজার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, তা জানালেন। মহামন্ত্রী প্রথমে গম্ভীর হয়ে কথাগুলি শুনলেন। তারপর মৃদু হাসলেন। এবং পরে হাসতেই থাকলেন।

'হাসছেন কেন মহামন্ত্রী!'

'মহারাজা কথা দিয়েছেন বটে, কিন্তু কোনওদিনই উনি সভা ডাকবেন না।'

'সভা ডাকবেন না! তা হলে কী করবো!'

'যুবরাজ, আপনার সঙ্গে আমাকে ওঁর কাছে যেতে হবে। গিয়ে একটি হুকুমনামা বের করে আনতে হবে। ব্যাস। তাহলেই হবে। এমন হুকুমনামা, যাতে যুবরাজ কুমার স্কন্দকে হুন দস্যুদের দমনের দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

তা দেখতে দেখতে গড়িয়ে গেল এক সপ্তাহ।

পরে আরও এক সপ্তাহ। অর্থাৎ এক পক্ষকাল। মহারাজের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এরপরে আর হাত গুটিয়ে থাকা যায় না।

চোর রতনের সঙ্গী হয়ে এবং মহামন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কুমার স্কন্দ গিয়ে হাজির হলেন মহারাজের কাছে। রাজা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে স্কন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুমার স্কন্দ, তুমি আবার এসেছ?'— এ রাতেও চলেছে সেই ফুলের মালা গাঁথা। — 'তা

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

SOCKS FOR STYLE DOWN TO YOUR FEET

BARUN

EXCLUSIVE SOCKS

B. K. International (P) Ltd.

A-125/1, Wazirpur Industrial area
DELHI-110 052

Phone : 2785-7039, 2737 6113 Fax No.: 2785 7066

তোমরা কী ভাবে ভেতরে ঢুকে এলে?' আমার শ্বশুর মহেন্দ্রপ্রতাপ আমাকে ঘিরে যে পাহারাদারদের বসিয়েছে, তাদের দুর্ভেদ্য প্রহরা ভেদ করে, কী করে ভেতরে এলে? তুমি যাদুবিদ্যা জানো নাকি! কিংবা কৌশল?'

'হ্যাঁ, কৌশল করে।' যুবরাজ ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'রাজ্যকে বাঁচাতে এই কৌশল করতে হয়েছে। একটি নির্দেশনামায় আপনাকে স্বাক্ষর করতে হবে। আপনাকে দায়িত্ব দিতে হবে একজন যুবরাজকে, যিনি হুন দস্যুদের খেদিয়ে এরাজ্য থেকে বের করে দেবেন।'

'তাই ত।'— মহারাজ কিংকর্তব্য বিমূঢ়।— 'কাকে এই দায়িত্ব দেওয়া যায়, মহামন্ত্রী?'

'কেন, এ বিষয়ে চিন্তার কী আছে! যুবরাজ স্কন্দকে এই দায়িত্ব দেওয়া হোক।'

'তা দেওয়া যায়। কিন্তু এরপর স্কন্দ যদি দস্যুদমন করে রাজসিংহাসনের দাবি করে!'

মহামন্ত্রী বললেন, 'তাই যদি করে ক্ষতি কী!'

'ক্ষতি আছে। আমার নতুন রাণীর গর্ভজাত সন্তান পুরগুপ্তকে আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন দিতে চাই।'

রাজার কথা শুনে চোখ কপালে উঠল মহামন্ত্রীর। তিনি বললেন, 'পুরগুপ্ত এখন নিতান্ত এক বালক, সে কী সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে হুন দস্যুদের দমন করতে সেনাবাহিনী নিয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে সক্ষম? এ আপনি কী বলছেন!'

'না, দস্যু দমনে যাবে না পুরগুপ্ত। সে পাটলিপুত্রে থেকে রাজধানী পাহারা দেবে।'

মহামন্ত্রী হাসলেন— 'সিংহাসনে বসে আছেন আপনি। উনি কী আপনাকে টপ্‌কে রাজ্য শাসন করবেন?'

'না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমিই রাজা।'

'বেশ, তাই থাকুন। এখন আপনি একটি নির্দেশনামা স্বাক্ষর করে দিন, হুন দস্যুদের দমন করতে সব দায়িত্ব দেওয়া হল যুবরাজ স্কন্দকে। যুবরাজ আপনার হয়ে সৈন্য পরিচালনা করবেন, আক্রান্ত অঞ্চল শাসন করবেন, এবং এ বিষয়ে রাজার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল।'

একটি কাগজে এই হুকুমনামা লিখেই এনেছিলেন মহামন্ত্রী— 'নিন, এই কাগজে স্বাক্ষর করুন।'

'তা করছি। কিন্তু এর ফলে পুরগুপ্তের কোনও ক্ষতি হবে না ত!'

'না।' হাসলেন মহামন্ত্রী— 'আপাতত পুরগুপ্তের কোনও ক্ষতি হবে না।'

পরের দিন প্রত্যুষ থেকেই শুরু হয়ে গেল সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি।

পড়ে গেল সাজো সাজো রব। শোনা যেতে থাকল পদাতিক বাহিনীর পদধ্বনি। তাদের কুচকাওয়াজ। দুন্দুভিনাদ।

শোনা যেতে থাকল অশ্বক্ষুরধ্বনি। শোনা যেতে থাকল রণহস্তীর হুঙ্কার। রাজধানী পাটলিপুত্র ঘোর কলরবে মুখর হয়ে উঠল। মহাবলাধিপতি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধযাত্রায় সেনাদের সাজিয়ে দিলেন। এইসব সেনাদের সঙ্গে মহাবলাধিপতি পৃথক একটি বাহিনী যোগ করে দিলেন, তারা হল— তীরন্দাজ বাহিনী।

যুবরাজ স্কন্দকে মহাবলাধিপতি বললেন, 'রাজকুমার, এই তীরন্দাজ বাহিনীটিকে সর্বদা কাছে রাখবেন। হুনদের মোকাবিলা করতে পারবে এই তীরন্দাজরাই। হুন দস্যুদের চোখ পেচকের মতো। তারা রাতের অন্ধকারেও বাইরের সব কিছু দেখতে পায়। আর তাদের যুদ্ধের প্রধান কৌশল হল তীরন্দাজী। বৃষ্টির মতো তারা শর বর্ষণ করতে পারে। তাদের ক্ষিপ্রতা সাপের মতন। এই দস্যুদলকে সোজা সাপ্‌টা যুদ্ধে পরাজিত করা শক্ত। তাদের পরাজয় ঘটাতে পারে আমাদের এই তীরন্দাজ বাহিনীই। কথায় আছে, বুনো ওলকে ঘায়েল করতে পারে একমাত্র বাঘা তেঁতুল। এখানে বাঘা তেঁতুল হল আমাদের তীরন্দাজরা।'

মহামন্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাবলাধিপতির কথাগুলি শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'যুবরাজ স্কন্দ হলেন যুদ্ধ-কুশলী, ইতিপূর্বে তিনি হুন দস্যুদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, তাদের খেঁদিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পাহাড়ের ওপারে। এবারেও যুবরাজ তা পারবেন। কোনও ভয় নেই। যুবরাজদের জয় হোক!'

এই ভাবে যখন পরস্পরের ভেতর কথা হচ্ছে, তখন হঠাৎ এক অশ্বারোহী এগিয়ে যুবরাজ স্কন্দের সামনে এসে দাঁড়াল। অশ্বারোহীর মাথায় একটি নীল পাগড়ি। গায়ে সবুজ রঙের পোশাক। এই অশ্বারোহীকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি স্কন্দ। পরে চিনতে পারলেন।

'যুবরাজ, আমি চোর রতন। আমি যুদ্ধে তেমন দক্ষ নই। তবে রণকৌশল জানি। হুন দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে এই মানুষটি আপনার সঙ্গী হতে চায়।'

'তা কেমন করে হবে? সেনা হতে গেলে প্রশিক্ষণ চাই। প্রশিক্ষণহীন কোনও মানুষকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়। রতন চোর, তা তুমি যতই চৌর্যকর্মে দক্ষ হও না কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি ব্যর্থ হতে বাধ্য।'— খুব ভারি গলায় কথাগুলি বলে গেলেন মহাবলাধিপতি।

'মহাশয়ের কথা শিরোধার্য। তবে আমি মহাবলাধিপতি মহাশয়কে জানাই, আমি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামব না। এই চোর রতন যুবরাজ স্কন্দের কাছাকাছি থাকবে মাত্র। প্রয়োজন মতো সুলুকসন্ধান যুগিয়ে যাবো।'

যুবরাজ স্কন্দ মহাবলাধিপতিকে জানালেন, 'তা চোর রতন যখন আমার সঙ্গী হতে চায়, হোক। বাধা নেই।'

এইভাবে যখন কথা উঠছে, তখন আরও এক কাণ্ড ঘটল।

হঠাৎ দেখা গেল মহারাজের নতুন শ্বশুর মহেন্দ্রপ্রতাপ কয়েকজন অশ্বারোহীকে নিয়ে সকলের সামনে এসে হাজির হলেন। সকলে অবাক! মহাবলাধিপতিও কম অবাক নন। মহেন্দ্রপ্রতাপ কেবল রাজার শ্বশুর নন, তিনি একজন সেনাধ্যক্ষও বটে। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ।

মহাবলাধিপতি বলে উঠলেন, 'কী মহেন্দ্রপ্রতাপজী, আপনিও কী হুন দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুবরাজ স্কন্দের সঙ্গী হতে চান না কি?'

'না। হুন দস্যুদমনে যুবরাজ স্কন্দের সঙ্গে যেতে পারলে খুবই ভাল লাগত। কিন্তু মহারাজ কুমার গুপ্তকে ছেড়ে যেতে পারছি কই! তা আমি না যেতে পারলেও আমার অধীনস্থ দক্ষ একদল অশ্বারোহীকে যুবরাজের সঙ্গে পাঠাতে চাই। এদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এই দলের সর্দার হল কীর্তিচন্দ্র। এই সর্দার যেমন সমর-নিপুণ, তেমনি উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতাও।'

যুবরাজ স্কন্দ বললেন, 'কীর্তিচন্দ্রকে দেখেই মনে হচ্ছে, উনি বিচক্ষণ। এমন বিচক্ষণ লোকই আমার দরকার।'

চোর রতন মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'আমি এঁকে চিনি। ইনি একদা বড়ো তীরন্দাজ ছিলেন। এঁর তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

এরপর শুরু হল যাত্রা। শত শত দুন্দুভি বেজে উঠল। গর্জে উঠল সেনাবাহিনী। শোনা যেতে থাকল অশ্বের ক্ষুরধ্বনি। হাতিদের হুঙ্কার। পঞ্চাশ হাজার সেনা বীরদর্পে হুননিধনে বেরিয়ে পড়ল পাটলিপুত্র থেকে।

যুবরাজ স্কন্দ এগিয়ে চললেন সকলের আগে। তাঁর পিছনে লাল পাগড়ি মাথায় এবং সবুজ পোশাকে চলল চোর রতন।

হুনদের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে, তার পরিকল্পনার ছক আগেই করে রেখেছিলেন মহাবলাধিপতি। কেবল কীভাবে লড়া নয়, কোথায় কোথায় গিয়ে হানা দিতে হবে

Shanti Gyan Niketan
SENIOR SECONDARY PUBLIC SCHOOL
Affiliated To Central Board of Secondary Education
GOYLA (DWARKA)
NEAR SECTOR - 19
NEW DELHI - 110 071
PHONE : 2531 6971/72/73
e-mail : sgns@vsnl.net
Website : www.shantigyanniketan.com

AryaTourist Lodge
- Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station
- Only 1 km. from Connaught Place
- Homely Atmosphare
- Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road
Ram Nagar,
New Delhi - 110055
Phones : 23622767, 23623398, 23618232
STD : 23530775, 23533398,23618232
Cont : 9811044543
E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in
Fax : 91-11-23636380

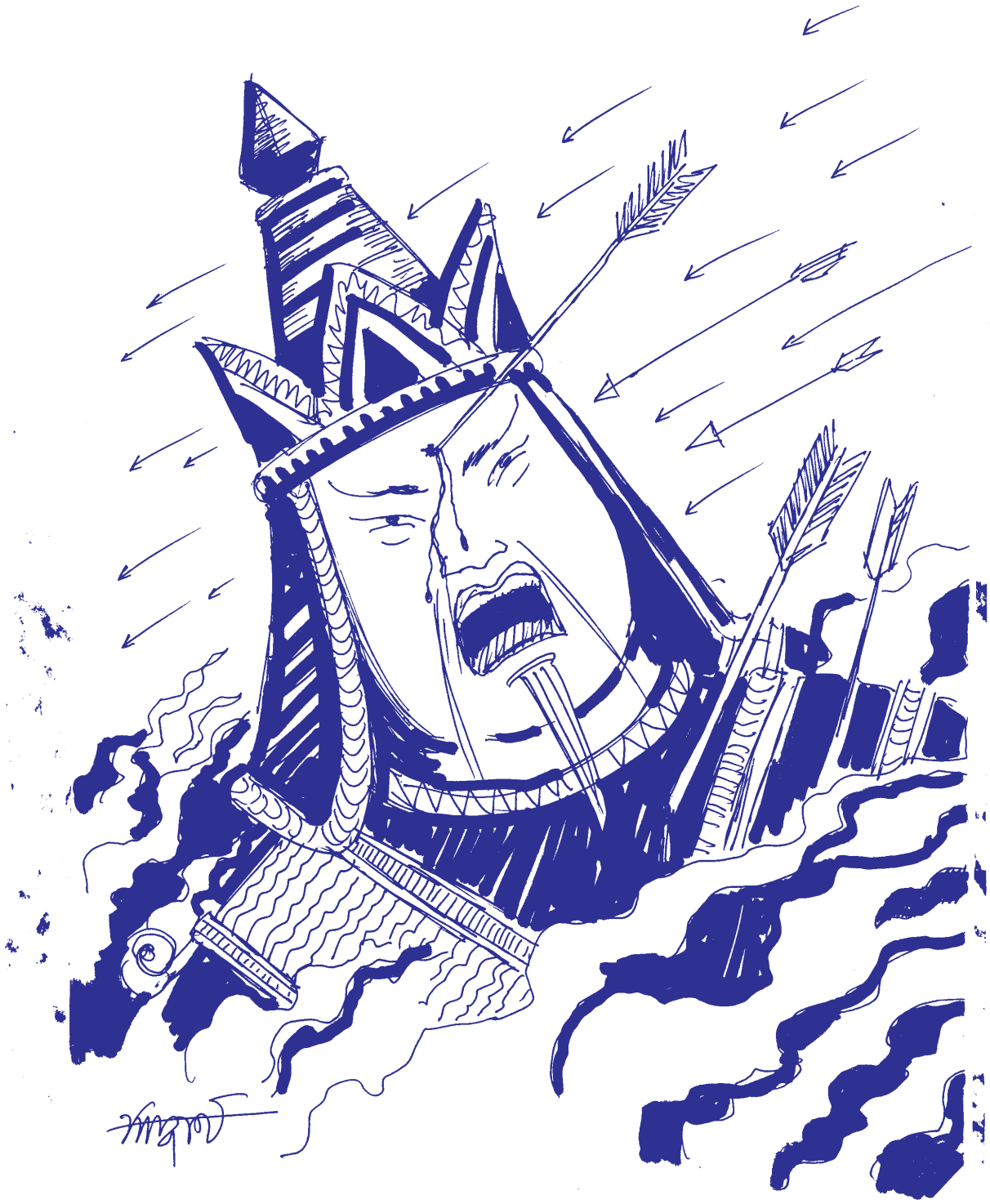

তারও একটা নক্সাচিত্র মহাবলাধিপতি তুলে দিয়েছিলেন যুবরাজের হাতে। এই নক্সাচিত্রে উত্তরের দেশগুলির নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

এখন সেই দেশগুলির দিকেই এগিয়ে চলল যুবরাজের সেনাবাহিনী।

তা উত্তরে দেশগুলির চেহারা সমতল দেশের মতো নয়। এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে পৌঁছতে হলে পার হতে হয় বিস্তর জঙ্গল, কখনও অনুচ্চ পাহাড়। কখনও বা সুদীর্ঘ প্রান্তর।

প্রথম প্রথম টের পাওয়া যায়নি, দিনকয়েক চলার পর টের পাওয়া গেল হুন দস্যুদের অত্যাচারের নির্মমতা। টের পাওয়া গেল তারা কেমন চরিত্রের দস্যু। তাদের নৃশংস পীড়নে

®
BRAND
ISI
MARKED

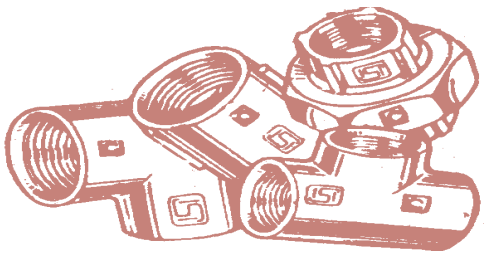

**HIGH GRADE
MALLEABLE IRON
HOT GALVANISED
PIPE FITTINGS**

MFD. BY.
Ph. : 260-1548/1566 R-256305, 257593.

CRESCENT ENGG. CORP.

G. T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR

Phones : Fac : 2222224, 2222225,
2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

ALL FASHION WEARS

M.T. GROUP
Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS
M.T. INTERNATIONAL
EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts,
Overlock Machines, Industrial Machine,
TA-1, Embroidery, Bag closer and
Aari Machines

গ্রামের লোকেরা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে। আর নগরের মানুষজন পালায় নগরের বাড়িঘর ফেলে নির্জন পাহাড়ের দিকে।

এক পরিত্যক্ত গ্রামের প্রান্তে দেখা পাওয়া গেল এক বৃদ্ধকে। বেচারা এক গাছে উঠে কোনওরকমে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। তিনদিন হল হুনেরা গ্রামখানি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিস্তর লোককে খুন করে চলে গেছে। এখনও অনেক বাড়িতে ধিকি ধিকি করে আগুন জ্বলছে। ঘরগেরস্থলির জিনিসপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ, গড়াগড়ি খাচ্ছে পথে, উঠোনে।

বেচারি বৃদ্ধ কোনওরকমে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু এখনও কাঁপছে আতঙ্কে।

তাকে গাছ থেকে নামিয়ে এনে চোর রতন হাজির করে দিল যুবরাজ স্কন্দের কাছে।

'হুন দস্যুদের তুমি নিজে চোখে দেখেছ?'

বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হ্যাঁ। বড়ো ভয়ঙ্কর।'

'দেখতে ভয়ঙ্কর, না কাজে ভয়ঙ্কর?'

'আঁজ্ঞে দেখতে গেলে খুদে রাক্ষস বিশেষ। ছোটো খাটো আকার। শরীরের থেকে মাথাটা বড়। চাপা নাক। পেতলের মতন রং। কুত্‌কুতে চোখ। ছোট।'

'প্যাঁচার মতো চোখ?'

'আঁজ্ঞে, সেই রকমই। চোখ দুটি হিংস্র। যেন আগুন জ্বলছে।'

'ওরা নগরে ঢুকে বসতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়'?

'হ্যাঁ, সে কী বীভৎস আগুন! আগুনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে আমাদের লোকজন দৌড়তে থাকে। তা সেই লোকজনকে ওরা তীর ছুঁড়ে মারে।'

'তাদের হাত থেকে কারও বাঁচার উপায় নেই?'

'না। ছোট ছোট শিশুরা পালাতে পারে না। আতঙ্কে কাঁদতে থাকে। তাদের ধরে আছড়ে মারে। তারপর তেলে ভেজানো কাপড় তাদের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালায়। রাতের আলোর কাজ করে সে আগুন। সে আলোয় ওরা রাতের খাবার খায়।'

'কী ভয়ঙ্কর!'— যুবরাজ বিস্ময়ে এবং ঘৃণায় ফেটে পড়েন।— 'ওদের হাত থেকে বাঁচার কী কোনও উপায় নেই?'

'না। লোকালয় ছেড়ে মানুষজন ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। কিন্তু জঙ্গলে গিয়েও মানুষ বাঁচতে পারে না। ওই হুনদস্যুরা দল বেঁধে জঙ্গলও ঘিরে ফেলে। তারপর আগুন লাগায় জঙ্গলে। জঙ্গল জ্বলতে থাকে। সে আগুনে মানুষজন সব পুড়ে মরে। তা শুধু কী মানুষ! জঙ্গলের পশুদেরও পুড়ে মরতে হয়। চারদিক থেকে আর্ত আর কাতর স্বর ওঠে, ওই সব স্বর শুনে ওরা ভারি আনন্দ পায়।'

বেচারি বৃদ্ধটি এই সব কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

কয়েকদিন অনাহারে থাকা মানুষটি এরপর সংজ্ঞা হারায়।

যুবরাজ স্কন্দ প্রবল বিক্রমে অভিযান চালাতে থাকলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে নানা ভাগে ভাগ করে দিয়ে চালাতে থাকলেন অভিযান। হুন দস্যুদের অবস্থিতির খবর যখন এবং যেখানে পাওয়া যেতে থাকল, সেখানেই তিনি পৌঁছে যান।

কিন্তু মজার ব্যাপার, তাদের কারোকে তিনি সামনা-সামনি পান না। তারা নানা অপরাধ সংগঠিত করে দিব্যি গা-ঢাকা দিতে থাকে। তারা যেন এক অলৌকিক মায়াবী শক্তি।

তবে তারা যে পিছু হটছে, এটাও মনে হতে থাকল যুবরাজের। তবুও তারা দুর্দমনীয়। তাদের নৃশংস হিংস্রতার কোনও যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

একদিন জঙ্গলের ভেতর এক হাতিকে দেখা গেল বিশ্রী হুঙ্কার করতে করতে উন্মত্ত অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে। যুবরাজ স্কন্দ সবিস্ময়ে দেখলেন, হাতিটির গায়ে গেঁথে রয়েছে কুড়ি-বাইশটি তীর। বোঝা গেল হুন দস্যুদের হিংস্র ক্রোধ থেকে রেহাই পায়নি বুনো হাতিও।

বনের বাঘ, গাছের পাখিও এই একই ভাবে হুনদের হিংসার শিকার হতে থাকল।

অভিযান চালাতে চালাতে যুবরাজ স্কন্দ একদিন ছাউনি ফেললেন এক পাহাড়ের পাদদেশে।

যুবরাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন, এই ভাবেই কী দিনের পর দিন সেনাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে? এর কী কোনও শেষ নেই। হুন দস্যুদের কী ধ্বংস করা যাবে না?

পাশেই বসেছিল চোর রতন। তার দিকে তাকিয়ে যুবরাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চোর রতন, তোমার চৌর্যবুদ্ধি কী বলছে? আমাদের অভিযানের শেষ কবে হবে? এবং তা কী করে?'

চোর রতন বলে, 'যুবরাজ, হুনদের শেষ করার একটা উপায় পাওয়া গেছে।'

'তাই নাকি! তা উপায়টি কী রকম?'

'আঁজ্ঞে, এই পাহাড়ের ওপরে একবারটি উঠতে হবে। তাহলেই দেখতে পাবেন, উপায়টি কী হতে পারে।'

'বেশ, চলো এখনই পাহাড়ে ওঠা যাক।'

কয়েকজন সেনা নিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলেন যুবরাজ। পাহাড়ের ওপরে উঠে চোর রতন বলল, 'একবারে নীচের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকুন, আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করে দূর দিগন্তের দিকে নিয়ে চলুন। তা এই ভাবে কিছু কী দেখতে পাচ্ছেন?'

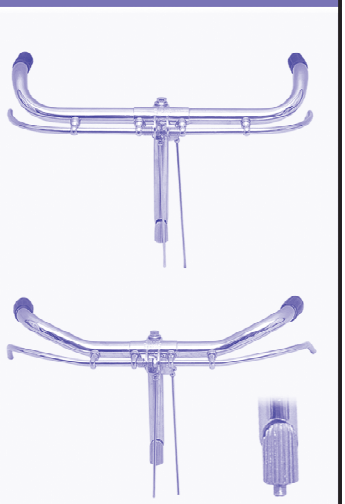

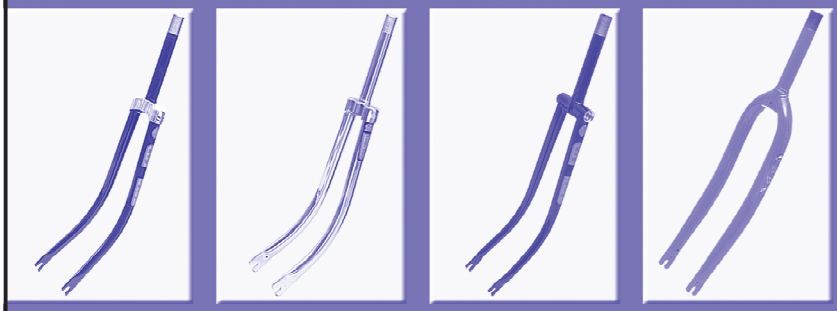

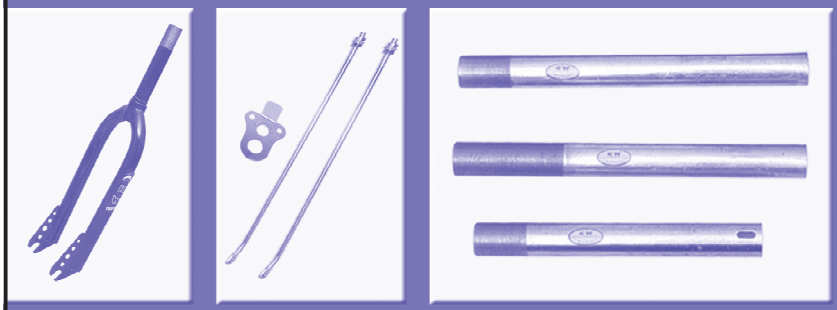

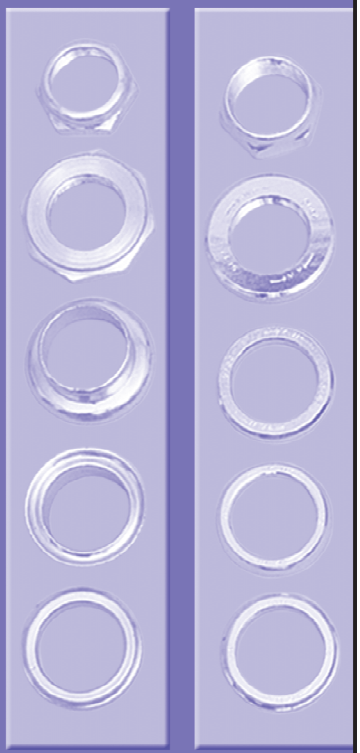

KW
K.W. ENGG. WORKS (REGD.)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

যুবরাজ দেখলেন, আকাশের ছায়াপথের মতো একটি প্রসারিত গাছ-গাছালির পোড়া বনপথ। কারা যেন চারপাশের গাছ-গাছালি পোড়াতে পোড়াতে উত্তরের দিকে এগিয়ে গেছে। এটা কী দাবানলের চিহ্ন?

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, এক ভয়ঙ্কর দাবানল অরণ্যভূমিকে পুড়িয়ে দিয়ে একটি দগ্ধপথ তৈরি করেছে।'

চোর রতন হাসতে হাসতে বলল, 'না, যুবরাজ। এ দাবানল নয়। এ হল দস্যুদের অগ্ন্যুৎসব। এরা আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে দূর অরণ্যে চলে গেছে।'

'এই ভাবে!'

'হ্যাঁ, যুবরাজ। হুনরা আগুন জ্বালাতে ভালোবাসে।'

'এতে ওদের কী লাভ?'

'দেশকে ধ্বংস করা।'— চোর রতন চোরা চোরা হাসতে থাকে।— 'এইভাবে দেশটাকে ধ্বংস করে, পরে তার ঘাড়ে চেপে বসে।'

'হুম্'। যুবরাজ গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই ভাবেই এবং এই ফন্দিতেই তাতারবাসীরা দেশ জয় করেছে!'

'হ্যাঁ যুবরাজ। ওরা তাতারবাসী নয়, ওরা নরকবাসী।'

'তা না হয় হল, কিন্তু এই অভিজ্ঞতায় আমাদের কী সুবিধা হল?'

'আমরাও আগুন জ্বালাব। এক ধরনের পোকা আছে, যারা আগুনের শিখা দেখলেই দৌড়ে এসে তাতে ঝাঁপ দেয়। আগুনকে তারা ভালোবাসে। কিন্তু আগুনেই তাদের মৃত্যু। এই হুন দস্যুদের এই একই নিয়তি। এদের আগুন জ্বেলে মারতে হবে।'

'ধ্যোৎ, এও আবার হয় নাকি?'

'হতেই হবে। আগুন দেখলেই এরা নিজেদের দলের আগুন মনে করে এগিয়ে আসবে। আর তখনই ওদের ঘিরে ফেলে মারতে হবে।'

যুবরাজ স্কন্দ হাসলেন। পরিকল্পনাটিকে অবাস্তব মনে হল।

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি!

ঋতম্ভর ছিলেন রাজা। কৌশাম্বির রাজা। তিনি কবেকার রাজা ছিলেন, তা যুবরাজ স্কন্দ জানেন না।

তবে তিনি কেমন রাজা ছিলেন, তা নিয়ে অনেক গালগল্প প্রচারিত রয়েছে। তাঁর অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যার কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন স্কন্দ। তা আজ সকাল থেকেই রাজা ঋতম্ভরের একটি কাহিনী মনে আসছে।

সেবার অযোধ্যার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে ঋতম্ভরের। ঘোর যুদ্ধ। এবং সে যুদ্ধে রাজা ঋতম্ভর বারবার বিপর্যস্ত এবং পর্যুদস্ত হচ্ছেন। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না। পিছু হটতে হটতে শেষে একটি জঙ্গলের ভেতর আশ্রয় নিতে হল।

জঙ্গলের ভেতর গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন রাজা। রাতের ঘুম চলে গেছে। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছেন।

তা সেই সময় আশ্চর্য একটি দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। রাজা দেখলেন, কী আশ্চর্য নিপুণতায় একটি মাকড়শা তার জাল বিস্তার করছে বড় কয়েকটি পোকাকে জালে আটকাবার জন্য। প্রথমে কয়েকবারে পোকারা জাল ছিঁড়ে ফেলল। মাকড়শা কিন্তু নাছোড়বান্দা। অপরিসীম তার ধৈর্য। সে জালের বাঁধন কৌশল বদলাতে বদলাতে শেষে পোকাদের আটকে ফেলল।

এই দৃশ্য দেখে রাজা ঋতম্ভর বুঝলেন, মাকড়শার মতো তাঁরও যুদ্ধ কৌশল বদলাতে হবে। তা তিনি কৌশল বদলে ফেললেন এবং শেষে অযোধ্যার অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করলেন।

যুবরাজ তাঁর যুদ্ধ কৌশল বদলাতে মতস্থির করলেন। এবং চোর রতনকে মাকড়শার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলেন।

যুবরাজ স্কন্দ তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে উত্তর দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। আর প্রতিটি সেনাধ্যক্ষ এবং সেনাপরিচালককে চোর রতনের কৌশলটির কথা গোপনে জানিয়ে দিলেন।

এরপর যা হল এবং যা হতে থাকল সে রীতিমত রোমহর্ষক।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর উদ্যোগেই নানা জায়গায় শুরু হয়ে গেল অগ্ন্যুৎসব। লেলিহান অগ্নিশিখা পোড়াতে থাকল বিশেষ বিশেষ জনপদ। আগুন জ্বলল গ্রামে গ্রামে। নগরে নগরে।

আগুন জ্বলতে দেখে হুন দস্যুরা রীতিমত হতচকিত হয়ে পড়ল।

একদল ভাবল, এই আগুন কারা লাগল? নিশ্চয় তাদের আর এক দল। কিন্তু এমন তো কথা ছিল না। হুন দস্যুদের অপরাপর দল ঠিক এইভাবেই অন্য দলগুলিকে সন্দেহ করতে থাকে।

দস্যুদের ভেতর পারস্পরিক অবিশ্বাস শুরু হয়ে গেল। তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ছিল পারস্পরিক যোগাযোগ অভাব। সুতরাং অবিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে গেল।

খবর গিয়ে পৌঁছুল হুন সর্দার তোরমান এবং মিহিরকুলের কাছে।

সর্দাররা বললেন, 'তাই ত, তাহলে কী নিজেদের ভেতর অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল নাকি!'

ছোট ছোট সর্দাররা বলল, 'এমন প্রতিযোগিতা হতে থাকলে আমরা সমূলে শেষ হয়ে যাবো। এখনই বিদ্রোহী হুনদের ধরে আটক করা দরকার। কিংবা তাদের শেষ করে দেওয়া হোক।'

হুন সদ্যুরা এরপর যা করল, সে কর্ম যুবরাজ স্কন্দ কল্পনাও করতে পারেননি।

দিবাবসানে যখন নেমে আসে আলো-আঁধারি, সেই সময় প্রতিটি অগ্নিবলয়কে ঘিরে ফেলতে থাকে হুন দস্যুরা। আসে পদাতিক তীরন্দাজের দল। আসে অশ্বারোহী তীরন্দাজরাও। শ্যাম পোকারা যেভাবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেকটা সেই ভাবে হুনরা আসতে থাকে।

যুবরাজের তীরন্দাজরা এই রকম একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। ছিল অন্তরালে, গা-ঢাকা দিয়ে।

হুনদের ওপর যুবরাজ স্কন্দের তীরন্দাজরা বৃষ্টির ধারার মত তীর বর্ষণ করতে থাকল।

এই রকম অপ্রত্যাশিত তীরবর্ষণে হুন দস্যুরা একে একে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তারা দিশেহারা।

ওই শর-বর্ষণ কোথা থেকে আসছে, তা তারা ঠিক ঠাহর করতে পারল না। কখনও ভাবল, এই তীর আসছে তাদের প্রতিপক্ষ থেকে। কখনও ভাবল, তারা ফাঁদে পড়েছে। এসব তীর আসছে যুবরাজ স্কন্দের তীরন্দাজ বাহিনীর কাছ থেকে।

অশ্বারোহী তীরন্দাজদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়া সমেত।

যারা বেঁচে গেল, সেইসব হুন দস্যুরা দৌড় দিল পাহাড়ের দিকে। পাহাড় পেরিয়ে সমতল ভূমির দিকে।

এদিকে হুন দস্যুদের খেদিয়ে দেশকে নিরাপদ করে যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের সৈন্যবাহিনী একে একে পাটলিপুত্রের কাছে সন্নিহিত একটি জনপদে এসে মিলিত হল। জনপদটি হয়ে উঠল একটি সেবা সমুদ্র।

ঠিক হল, সেখান থেকে তারা বিজয় নিশান নিয়ে রাজধানীতে গিয়ে প্রবেশ করবে। পাটলিপুত্রকে উদ্বেল করবে।

রাজধানীতে ঢুকে সোজা চলে যাবে রাজপ্রাসাদে। মহারাজ কুমারগুপ্তের কাছে। সৈন্যবাহিনীর সামনে থাকবেন যুবরাজ স্কন্দ স্বয়ং। সে ভারি এক বিজয় মিছিল হবে।

সব প্রস্তুত। কিন্তু যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে গোল বাধাল চোর রতন।

চোর রতনের তখন খুব খাতির যুবরাজ স্কন্দের কাছে। তার প্রতিটি কথা যুবরাজ মন দিয়ে শোনেন। মানেন এবং

সেইমত কাজ হয়।

চোর রতন একান্তে যুবরাজকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'যুবরাজ, রাজপ্রাসাদের দিকে যখন যাওয়া হবে, তখন কিন্তু আপনি সেনাবাহিনীর সামনে থাকবেন না। তখন সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেবে মহারাজের শ্বশুর মহেন্দ্রপ্রতাপজীর প্রেরিত সর্দার কীর্তিচন্দ্র।

যুবরাজ স্কন্দ ক্ষুণ্ণ মনে বললেন, 'তা কেমন করে হয়? আমি যুবরাজ হয়ে পিছনে থাকব, আর সামনে থাকবে ওই হতচ্ছাড়া কীর্তিচন্দ্র!'

'হ্যাঁ। চিন্তা নেই, তাকে আপনার মতো পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। মনে হবে, উনিই হলেন যুবরাজ।'

'এর মানে কী, এটা কী ঠাট্টা নাকি!'

'হ্যাঁ, এক রকম তাই। তবে ঠাট্টা নয়। কিছু লোককে ঠকানো। তারা অত খতিয়ে দেখবে না। তারা ভাববে যুবরাজই সামনে রয়েছেন।'

যুবরাজ স্কন্দ আর কথা বাড়ালেন না। চোর রতনের কথায় সম্মত হলেন। 'বেশ তাই হোক।'

চোর রতন ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'হুন-পোকা খতম হয়েছে, এবার দেখুন 'ঘুণপোকা' কী ভাবে খতম হয়।'

তা চোর রতনের প্রস্তাব মতন কীর্তিচন্দ্রকে সৈন্যদের সামনে নিয়ে পাটলিপুত্রের রাজ অট্টালিকার সামনে সেনাবাহিনী এসে দাঁড়াল। সহস্র গলায় শুরু হল জয়ধ্বনি দেওয়া। চারদিক থেকে ভেসে আসতে থাকল অভিনন্দন ধ্বনি।

আর তখনই অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি অঘটন ঘটল।

প্রাসাদশীর্ষ থেকে একটি তীর বিদ্যুৎ বেগে এসে কীর্তিচন্দ্রের বুকে বিঁধে গেল। কীর্তিচন্দ্র মুহূর্তে প্রাণ হারাল। তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সকলে ভাবল, এ কী বিড়ম্বনা! যুবরাজ এইভাবে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন! চারদিক থেকে 'হায় হায়' শব্দ উঠল।

চোর রতন তখনই উঠে দাঁড়াল প্রাসাদের তোরণ চূড়ায়। চীৎকার করে সে বলতে থাকল, 'আপনারা 'হায় হায়' করবেন না। যুবরাজ স্কন্দ বেঁচে আছেন। তিনি পিছনে আছেন। তিনি সুস্থ রয়েছেন। অভীঃ! কোনও ভয় নেই।'— এরপর চোর রতন যুবরাজকে টেনে তুলে নিল তোরণ চূড়ায়। এই দেখুন, যুবরাজ স্কন্দকে। যুবরাজ কেমন আছেন, দেখুন।'

এরপর ঢোকা হল প্রাসাদে।

দেখা হল, মহারাজের সঙ্গে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, মহারাজের শ্বশুরকে কোথাও পাওয়া গেল না। সেনাধ্যক্ষ মহেন্দ্রপ্রতাপ কিছু আগেও ছিলেন। কিন্তু এখন নেই। সকলে এই রকমই বলতে থাকল। সকলেরই প্রশ্ন, কোথায় তিনি?

রাত্তির বেলা, যুবরাজ একান্তে চোর রতনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার রতন, কীর্তিচন্দ্র হঠাৎ আততায়ীর হাতে খুন হল কেন? আর কেনই বা সেনাধ্যক্ষ মহেন্দ্রপ্রতাপ পালিয়ে গেলেন? তিনি কি হারিয়ে গেলেন?'

চোর রতন হাসতে হাসতে বলল, 'যুবরাজ! আপনি খুব বড়ো যোদ্ধা হতে পারেন, কিন্তু কূটকৌশল আপনি তেমন জানেন না। আপনার পোশাকে দেখে কীর্তিচন্দ্রকে মহেন্দ্রপ্রতাপ আপনি বলে ভুল করেছেন। তিনি আগে থাকতেই ছক কষে রেখেছিলেন। আপনাকে খুন করে তাঁর নাতি পুরগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের পথ সুগম করে রাখবেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর অভিপ্রায় আমি আগাম আন্দাজ করে অন্যভাবে ঘুঁটি সাজিয়েছি। বেচারা মহেন্দ্রপ্রতাপ! তিনি ধরা পড়ে গেলেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ঘুণ পোকাটি এইভাবে নিজে নিজেই সরে গেলেন। তাঁকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন।'

'তোমার এত বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধির জোরে আমি বেঁচে গেলাম। বেঁচে গেল গুপ্তবংশ। তোমাকে আমি মন্ত্রীত্বের পদে বসিয়ে দেব। নতুবা রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন করে দেব।'

চোর রতন হা হা করে হেসে ওঠে। ''চোর রতনের উপাধি হবে 'নবরত্ন'। — আর লোকে চোর রতন বলবে না।''

গঙ্গারিডি সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন।

রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা

সমিত দে

কিছুটা ইতিহাস, কিছু কাহিনী, হয়তো বা কিছুটা কল্পনার রঙ মিশিয়ে চলুন না যাই আমরা সেইখানে— সেই কালে, সেই সমাজে, সেই পূর্বপুরুষদের কাছে, যাঁদের শোণিতধারা হয়তো আজও আমাদের শরীরের প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী হিসাবে যাঁদের আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বিদেশী, বিশেষ করে সাদা চামড়ার লোকেদের বক্তব্যই আমাদের কাছে বেশি গ্রহণীয়। তাই এক বিদেশী কবির কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেই আমরা যাত্রা শুরু করি কুয়াশা ঢাকা আলো-আঁধারের রাজ্যে।

রোমের মহাকবি ভার্জিল (খৃঃ পূঃ ৭৭-১৯ অব্দ) তাঁর 'জর্জিস' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন—

"On the doors will present
In solid gold and ivory...
The battle of Gangaridae"

গঙ্গারিডিদের যুদ্ধটা কোথায় হয়েছিল জানা যায়নি। কিন্তু গঙ্গারিডিরা যে সমৃদ্ধশালী ও যোদ্ধৃজাত হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল ওই কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিই তার প্রমাণ। কিন্তু কারা এই গঙ্গারিডি?

গঙ্গারিডি নামটির মধ্যেই রয়েছে রহস্য-রোমাঞ্চের গন্ধ। গ্রীক-রোমানরা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে "Gangaridi" এবং "Gangaridae"। এদুটি এমন শব্দ যার প্রকৃত রূপ তখনকার দিনে ঠিক কি ছিল, তা জানা যায়নি। তবে অনেকে বলেন, 'গঙ্গারাষ্ট্র' গ্রীক উচ্চারণে বিকৃত হয়ে 'গঙ্গারিডি' হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান বা জনগোষ্ঠী হিসাবেই বা গঙ্গারিডিদের কি পরিচয় ছিল তাও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ই সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণে গঙ্গারিডিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি এইরকম—

আলেকজাণ্ডার পুরুকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের দিকে অভিযানের পরিকল্পনা করলে তাঁর সৈন্যরা আর এগোতে চাইল না, গঙ্গারিডিদের কথা শুনে। আলেকজান্ডার সংবাদ পেলেন, গঙ্গারিডিরা প্রাসীওদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশরক্ষার জন্য দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার রথ, আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ছয় হাজার রণহস্তী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এই বিপুল সমরসজ্জার বিরুদ্ধে আলেকজান্ডারের সৈন্যরা আর এগোতে সাহস পেল না। বাধ্য হয়ে আলেকজান্ডারকে বিজয় অভিযানের বাসনা ত্যাগ করে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

গঙ্গারিডিদের সমরোপকরণ সম্বন্ধে গ্রীক ঐতিহাসিকদের

With the best Compliments from :

Jindal Mectec (P) Ltd.

Old Manesar Road,
Narsinghpur, Gurgaon-122 001
Haryana (INDIA)

tel : +91-124-4393200 / 4086401
fax : +91-124-4030807
cell : +91-9891599051
e-mail : pawan.jindal@jindalbrothers.in
web : www.jindalmectec.com

With the best Compliments from :

Damiyaas
Enterprises

WHOLE SALE & RETAIL OF GOLD JEWELLERY

Gems & Diamond Jewellery
1, Ambedkar Road,
Ghaziabad-201 001 (U.P.)
Phone : 0120-4120728
Mobile : 9871835848

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

লিখিত বিবরণ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে তাঁরা এক বিশাল সমৃদ্ধশালী, রণকুশলী, স্বাধীনচেতা, মর্যাদাসম্পন্ন জাতি ছিলেন। আর এখন পর্যন্ত যা আবিষ্কার হয়েছে এবং তাতে এটা নিঃসন্দেহ এবং অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই গঙ্গারিডিদের রাজ্য ছিল অর্থাৎ আজকের বাঙালীর পূর্বপুরুষ ছিলেন ওই গঙ্গারিডি জাতি।

যে কয়েকজন বিদেশী লেখক গঙ্গারিডিদের সম্বন্ধে লিখেছেন এঁদের মধ্যে একজন হলেন টলেমি ল্যাগাস-আলেকজান্ডারের স্টেপ ব্রাদার। তাঁর লেখা "Life of Alexander the Great" বইটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও এর বিবরণের উপর নির্ভর করে কার্টিয়াস রুথাসে (১ম-২য় শতক) গঙ্গার সন্নিকটে প্রাসী ও গঙ্গারিডি দুটি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' না পাওয়া গেলেও আরিয়ান, স্ট্রাবো, ডিওডোরাস প্রভৃতি গ্রীক লেখকরা 'ইন্ডিকা'র বহু অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সেখানে গঙ্গানদীর অববাহিকায় বসবাসকারী গঙ্গারিডিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডিওডোরাস (খৃঃ পূঃ ১ম অব্দ) রচিত 'বিবলিওথিকা হিস্টারিকা' গ্রন্থে গঙ্গারিডি জাতির পরিচয় দিয়েছেন— 'তিন মাইল (30 stades; 1 stade = 520 ft) প্রশস্ত গঙ্গা নদীর মোহনার পূর্বদিকে গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর সীমানা। যারা চার হাজার সুশিক্ষিত রণহস্তীর বৃহত্তম বাহিনীর অধিকারী। এজন্য এরা কখনও কোনও বিদেশী রাজার অধিকারভুক্ত হয়নি। টলেমির (২য় খৃষ্টাব্দে) বর্ণনায় আছে, 'গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল। তাদের রাজধানী ছিল গাঙ্গী। গঙ্গানগর বলে নগর হিসাবেও এটিকে ধরা চলে।'

টলেমি গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের যে হিসেব দিয়েছেন, তাতে অনুমান হয় যে গঙ্গানগরের ভৌগোলিক অবস্থান গঙ্গাসাগর বা গঙ্গাসাগর সঙ্গমের কাছাকাছি কোথাও। (ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার)। তাঁর বর্ণনানুসারে গঙ্গার প্রধান মুখের নাম মেগা (Mega-great)। অনেকে মনে করেন, গঙ্গার সেই প্রধান মুখ আদিগঙ্গার মোহানা এবং প্রাচীন গঙ্গানগর সম্ভবত বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে বিলীন।

এছাড়াও এক অজ্ঞাত পরিচয় মিশরীয় নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে (১ম খৃষ্টাব্দে) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে গঙ্গানগর ও বন্দরের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। আরব ও পারস্য উপকূল অতিক্রম করে পশ্চিমঘাট উপকূল ধরে ভারত মহাসাগর দিয়ে ঘুরে পূর্বঘাটের উপকূল বরাবর এগিয়ে এসে বাঁদিকে সুন্দরবনের উপকূল ভাগকে রেখে পূর্বদিকে যাওয়ার সময় শতমুখী গঙ্গার প্রধান মুখে তিনি গঙ্গানগরকে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'এখানেই গঙ্গানদী সাগরে পড়েছে। নীলনদের মতো এর জল কমে-বাড়ে। নদীর তীরে মার্কেট টাউন। তার নাম গঙ্গে বা গঙ্গ। এখানে ব্যাপক কেনাকাটা চলে। তেজপাতা, সুগন্ধি গাঙ্গেয় অঞ্জন তৈল, প্রবাল ও মুক্তো এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের মসলিন। যার নাম গাঙ্গেয় মসলিন।' এখানে একটি সোনার খনির অবস্থানের কথাও তিনি লিখেছেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, গঙ্গানদীর মোহনায় যে সমুদয় লোক বাস করতো তারাই গঙ্গারিডি এবং বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণ দিকে প্রাসীরা বাস করত।

রামায়ণের আদিকাণ্ডে উল্লিখিত সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী, গঙ্গাসাগরের সাংখ্যদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রম তথা ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের কাহিনী আমাদের সবার জানা। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হিসাবে গঙ্গাসাগরের উল্লেখ আছে। মহাভারতের, ভাগবতের, বিভিন্ন পুরাণে মহর্ষি কপিল ও তাঁর আশ্রমের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ মহর্ষি কপিল, তাঁর সাংখ্যতত্ত্ব

গঙ্গারিডি সভ্যতার শিল্পকলার ধ্বংসাবশেষ।

প্রবর্তনের কাল ও গঙ্গাসাগর তীরে তাঁর আশ্রম — এই সময়কাল খুবই প্রাচীন। অধ্যাপক হেরেসা উইলসন তাই বলেছেন, "... we must go back to the remote age (than the Neo-Platonists) for the origin of the dogmas of Kapila". [Preface, Sankhyakarika]।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশীয় সাহিত্য, পুরাণ ইত্যাদিতে যেমন তেমনি মিশরে, রোম, গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক, ভ্রমণকারীরা দক্ষিণ-বাংলার এই গঙ্গা-মোহনার নগর, বন্দর, জনপদ, গঙ্গারিডি জাতি এবং তাঁদের শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা ও শৌর্যবীর্যের কথা লিখে গেছেন।

মৌর্য, প্রাক মৌর্য এমনকি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার প্রত্ন নিদর্শন আজ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে। মাটির তলার লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আজ প্রত্নবস্তু হয়ে সাগরদ্বীপ, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, পাকুড়তলা,

পাথরপ্রতিমা, ছত্রভোগ, রায়দীঘি, কঙ্কনদীঘি, বাসন্তী, গোসারা আর নেতিধোপানীর গভীর বনাঞ্চল ভেদ করে আস্তে আস্তে উঠে আসছে ইতিহাসের কঙ্কাল হয়ে— শোনাচ্ছে তাদের কথা।

গঙ্গারিডিদের সমৃদ্ধির কথা তো সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ - ২য় শতক অর্থাৎ কুষাণ যুগ পর্যন্ত যা গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। তাঁদের লেখায় ঐশ্বর্য, বাণিজ্য, শক্তি ও প্রাধান্যের খ্যাতিতে সমৃদ্ধ পূর্বভারতের একটি বিশেষ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তাই তো সুদূরে বসেও বঙ্গোপসাগরের কূলে গঙ্গারিডিদের বৈভব ও পরাক্রম মহাকবি ভার্জিলের মনে ঢেউ তুলেছিল। আর সেই জাতিই হল আমাদের পূর্বপুরুষ! সে এমনই একটি জাতি যাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম লোভ, পররাজ্য গ্রাসের মদমত্ত বা উন্মত্ত আচরণ, ধ্বংস বা অত্যাচারের অভিযোগ কারুর নেই। ঐশ্বর্য, বীর্যবত্তা ও সম্পদে সমৃদ্ধ এই জাতির এমন এক স্বতন্ত্র মানবিক ব্যাপার এই ঐতিহাসিকরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন এঁদের কথা বারবার লিখতে। তবে ওই পর্যন্তই। তারপর সবটাই কুয়াশায় ঢাকা। গুপ্তযুগ থেকে পরবর্তীকালে আর কোথাও গঙ্গারিডি নামের উল্লেখ নেই। কালের কুটিল চক্রে একদিন গঙ্গারিডি সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো। সেইসঙ্গে অস্তমিত হল গঙ্গে বন্দর ও রাজধানীর গৌরবও। আকস্মিক ভূমিকম্প/ঝড়ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংস হল সমগ্র ভূখণ্ড। চিরকালের মতো হারিয়ে গেল এক সুসভ্য জাতির সভ্যতা— সংস্কৃতির ইমারত। এই সুপ্রাচীন সভ্যতার যবনিকা উন্মোচনের দায়িত্ব নবীন প্রজন্মের গবেষকদের।

তথ্যসূত্র :— ১. রহস্যময় গঙ্গারিডির খোঁজে : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২. দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায় : কৃষ্ণকালী মণ্ডল, ৩. যুগে যুগে গঙ্গাসাগর : ব্যোমকেশ মাইতি, ৪. যশোর খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র, ৫. বাংলা নামে দেশ : আলী ইমাম।

ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু

—শ্রীরামকৃষ্ণ

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সর্ব্বদা ইষ্ট চিন্তা করলে, অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে। —মা সারদা

—জনৈক শুভানুধ্যায়ী

LAKRA INDUSTRIES LTD.

E- 200-201, PHASE - IV, FOCAL POINT, LUDHIANA - 10 (INDIA)

e-mail : lakra@lakragroup.com, Website : www.lakragroup.com

Ph. (0) 0161-2672563, 2674863, 2677163, 2675473, Fax : 0161-2670263, TIN : 03131147443

LAKRA FABRICS PVT. LTD.

Mfrs. & Processor of :

Cotton, Synthetic, Blended Knitted Fabric & Garments.

E-9, Phase - IV, Focal Point, LUDHIANA -10 (INDIA)

Website : www.lakragroup.com, e-mail : info@lakrafabrics.com

ST / CST : 51517914 Dt. 02.04.1997

TIN : 03431147084

Ph. (0) 0161-2675473, 0161-2675474, Fax : 0161-2670263

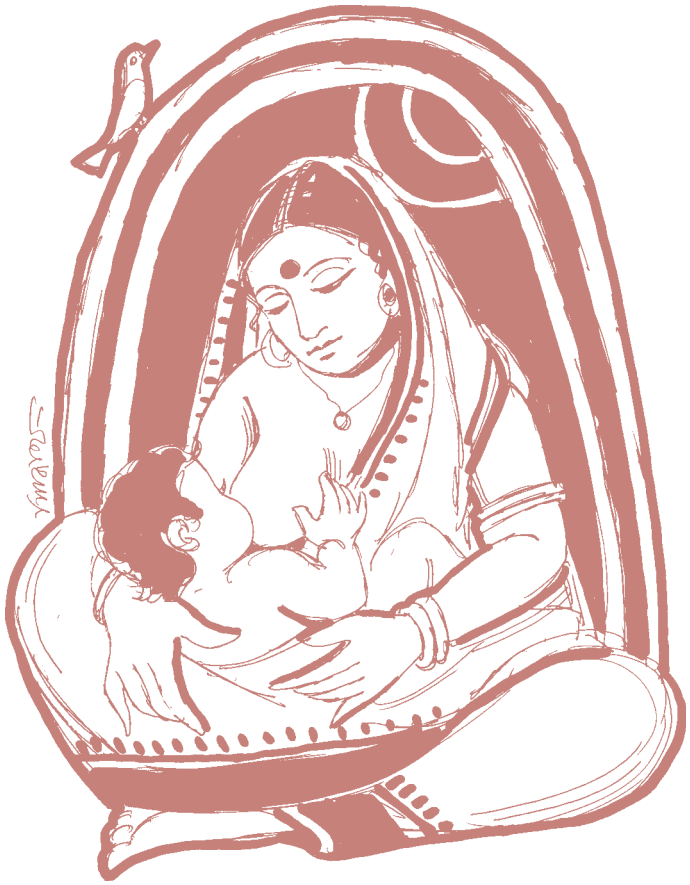

মধুক্ষরণ

রত্না ভট্টাচার্য

কলেজের বন্ধুরা আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবে বলেছে— সকালে কলেজ যাবার আগে খাবার টেবিলে বসে সম্পূর্ণা বলল তার মাকে।

অঘোরময়ী ভাত বেড়ে দিচ্ছিলেন মেয়েকে।

অঘোরময়ীর তিন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে অশোক সওদাগরী অফিসে ভালো চাকুরে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। সে এখন স্বামী সঙ্গে দিল্লীতে থাকে। বড় জামাই ইঞ্জিনিয়ার। দিল্লীতে সরকারি কর্মচারী। সম্পূর্ণা সবার ছোট। ওর জন্ম দেশ বিভাগের সময়ের কাছাকাছি। একুশ বছর বয়সের সম্পূর্ণা বেশ সপ্রতিভ। দেখতে সুন্দরী এবং লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভালো।

রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিদ্যা নিয়ে এম এস সি পড়ছে। এরপরে পি এইচ ডি করে অধ্যাপক হবার ইচ্ছে।

'কতজন আসবে? ছেলেরাও আসবে?'— অঘোরময়ী জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েকে।

'সব মিলিয়ে পাঁচজন। মা! সিরাজও আসবে। ওকে কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। সবার সঙ্গে আসবে। দেখো, ও খুবই ভদ্র আর ব্যবহারও ভালো।' — একটু আবদারের সুরেই সম্পূর্ণা মাকে জানাল।

একটি মুসলমান ছেলের প্রশংসা, মুখার্জী পরিবারের মেয়ের মুখে, অঘোরময়ীর একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না। সম্পূর্ণা দেখল, তার মায়ের দুই ভ্রু'র মাঝে সিঁদুরের টিপটি কুঁচকে যাচ্ছে।

সকালে স্নানের পর চুল ছেড়ে কপালে সিঁদুরের টিপ পরে মা যখন পুজোর ঘরে ঢোকেন তখন মাকে প্রতিমার মতো দেখতে লাগে। এখনও অঘোরময়ী যথেষ্ট রূপসী। এই বয়সেও লাবণ্য কম নেই চেহারায়। সম্পূর্ণা বুঝল যে মা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। হেসে বলল— 'তুমি একদম চিন্তা করো না। সিরাজ আমার শুধুই বন্ধু। বিশেষ কেউ নয়। তুমি মাছের চপটা বানিও কিন্তু। আমার বন্ধুরা তোমার হাতের মাছের চপ আর পায়েস খেতে আসছে। সঙ্গে

রসবড়াও বানাতে পার। ওটাও তোমার হাতে দুর্দান্ত হয়।'

'তুই নিজের খাবার তালিকা বানাচ্ছিস না বন্ধুদের জন্য বলছিস? এত রান্নায় সাহায্য করবে কে?'

'কেন কুসুমদি? আমি যে কলেজ যাব। না হলে আমিই তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'— সম্পূর্ণা বলল।

'কুসুমকে এখন ডাল বাটতে বললে বিরক্ত হবে। বরং রসবড়াটা বাদ থাক। আমি ভালো মিষ্টি আনিয়ে দেব।'

সম্পূর্ণা কলেজে বেরিয়ে যাবার পর অঘোরময়ী মাছের পুর বানাতে বসলেন।

একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। অনেক কথা আজ অনেকদিন পরে মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই দেশ বিভাগের সময়। চারপাশ তখন জ্বলছে, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আগুনে।

সম্পূর্ণার তখন এক বছর হতে দু-মাস বাকি। সম্পূর্ণার পিতৃদেব অমলেন্দু মুখার্জী তখন কর্মসূত্রে বেনিয়াপুকুর থানায় আছেন। থানার উপরেই কোয়ার্টারে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে অঘোরময়ীর সংসার।

সেদিন ছিল শুক্রবার। আজও পরিষ্কার মনে আছে। তখন চারপাশে কারফিউ চলছে। অঘোরময়ী দুপুরের খাবার খাইয়ে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে একটা সেলাই নিয়ে বসেছেন। অঘোরময়ীর মন ভালো নেই। একে দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়, তার উপর কোলের মেয়েটি বেশ দুর্বল। একসঙ্গে মায়ের দুধ পুরোটা খেতে পারে না। তাই ডাক্তারের কথামত ওকে ছাগলের দুধে জল মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। এদিকে অঘোরময়ীর বুকে অফুরন্ত দুধ। কিছুক্ষণ অন্তর বুক টন্ টন্ করে। মেয়ে না টানলে ব্লাউজ ভিজে ওঠে আর যন্ত্রণাও হয়। অনেকসময় অঘোরময়ীকে নিজেই টিপে টিপে দুধ ফেলে দিতে হয়। ইস্ মায়ের মধুভাণ্ডের বদলে মেয়েটা ঝিনুক বাটিতে ছাগলের দুধ খায় কোন স্বাদে! মেয়েটা এতটাই দুর্বল যে বেশিক্ষণ দুধ টেনে খেতেও পারে না।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে অঘোরময়ী অবাকই হলেন। এই অসময়ে থানার কাজ ফেলে তাঁর স্বামী তো উপরে আসবেন না। আর এই ডামাডোলে কোনও আত্মীয়-স্বজনেরও আসার প্রশ্ন নেই। সেলাইটা পাশে রেখে উঠে এসে অঘোরময়ী দরজা খুললেন।

সম্পূর্ণা বুঝতে পারছে মায়ের মানসিক অবস্থার কথা। মায়ের আশঙ্কা অমূলক নয়। সত্যিই সিরাজ সম্পূর্ণার প্রতি একটু বেশিই মনোযোগী। অথচ ব্যবহার এতই অমায়িক যে রাগও করা যায় না। সিরাজ সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান। কপালের ডানপাশে ছোট লাল রঙের জরুলটার জন্য ওকে অন্যরকম দেখতে লাগে। জরুলটা অবশ্য চুলেই ঢাকা থাকে। তবে মাথা ঝাঁকানোর সময় চুল সরে গেলে দেখা যায়। সিরাজকে বন্ধুরা সবাই পছন্দও করে। বেশ রসবোধ আছে ছেলেটির। তবে সম্পূর্ণার প্রতি ওর আলাদা মনোযোগ নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টাও করে থাকে। তবে অঘোরময়ী মুখার্জীর মেয়ে সম্পূর্ণা এই ব্যাপারে এতটাই নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে থাকে যে, বন্ধুরা ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশিদূর এগোয় না।

সম্পূর্ণাদের বাড়িতে বন্ধুদের আসার ব্যাপারটার জন্য রথীনই দায়ী। ও সিরাজকে উস্কাল। আর সিরাজও তেমনই। সম্পূর্ণাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল— 'আমি কি তোমাদের বাড়িতে যেতে পারি?'

কি করে সম্পূর্ণা! কেমন করে বলবে যে আমাদের মুখার্জী পরিবার। আমার মা ঠাকুর পুজো না করে জল স্পর্শ করেন না। তোমাকে স্পর্শ করলে মা আবার অবেলায় স্নান করবেন। আর বাবা— অনেকদিন আগে যদিও অবসর গ্রহণ করেছেন, তাহলেও পুলিশী মেজাজ এখনও রয়ে গিয়েছে। তুমি আমাদের বাড়িতে এসো না। কথাগুলো সম্পূর্ণা মনে মনে বলল আর মুখে সম্মতি জানাল।

গত পরশুদিন সবে ডি ভি মানে দেবজ্যোতি ভার্মার ক্লাশটা শেষ হয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশের আগে দুটো পিরিয়ড অফ থাকায় ওরা মেয়েরা কয়েকজন ক্যান্টিনে গিয়েছিল। হঠাৎ বি সেকসনের সৌমিত্র এসে শুধু শুধু ঝগড়া বাধাল।

'কি রে সম্পূর্ণা? তুই কি স্যারের রেফারেন্স দেবার আগেই লাইব্রেরী থেকে বইগুলো সব তুলে নিবি ঠিক করেছিস?'

সৌমিত্রকে সবাই পড়াশোনায় ভালো ছেলে বলেই জানে। সবাই ধরে নিয়েছে যে এবারে ও ফার্স্ট ক্লাশ পাবে। তবে র‍্যাঙ্কে কে কতটা এগিয়ে যাবে তা অবশ্য কেউ জানে না। কারণ সম্পূর্ণাও যথেষ্ট মেধাবী ছাত্রী।

ভাস্বতী, নূপুর, বেবি আর সম্পূর্ণা মিলে একসঙ্গে লাইব্রেরী থেকে বই নিয়েছে। প্রত্যেকের কার্ডে দুটো করে। পরে নিজেদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি করে নেবে বলে ঠিক করেছে। সৌমিত্র এভাবে সম্পূর্ণাকেই আক্রমণ করছে কেন? ছেলেদের মধ্যে থেকে সিরাজই এগিয়ে এল। ও বলল, 'তুমি সম্পূর্ণাকে এভাবে বলছ কেন? স্যার রেফারেন্স দেবার পর আমরা অনেকেই বই তুলেছি। তুমিও বই নাও।'

'থাকলে তো নেব।'— সৌমিত্রর ঝাঁঝাল উত্তর।

লাইব্রেরীর জীতেনদা তো বলেই দিলেন— 'সম্পূর্ণাকে এবারে রেজাল্টে কে আটকাবে? স্যার বলার আগেই এসে ঠিকঠাক বইগুলো তুলে নেয়।'

সম্পূর্ণার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সিরাজ সোজাসুজি সম্পূর্ণার

দিকে তাকিয়ে সৌমিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল— 'সম্পূর্ণা ভালো মেয়ে এবং মেধাবী, তা আমরা সবাই জানি। তুমিও ভালো। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাস্থ্যকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তুমি তোমার রূঢ় ব্যবহারে সেটা প্রকাশ হতে দিও না। আমাদের খারাপ লাগছে আর সম্পূর্ণার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আরে তুমি জানো না, সুন্দরী মেয়েদের মনে কষ্ট দিতে নেই।'

পরিস্থিতিটা সিরাজ হাল্কা করে না দিলে সম্পূর্ণার ওই মনখারাপ ভাবটা তিনদিন থাকত।

ছোটবেলা থেকেই একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণা খুব স্পর্শকাতর। কেউ কিছু বাজে কথা বললে বা দুঃখ দিলে ঠিক তিনদিন ওর ভীষণ মন খারাপ হয়। ওই তিনদিন ওর কিছুই ভালো লাগে না।

দরজা খুলে অঘোরময়ী দেখলেন যে একটি বছর দেড়েকের শিশুকে কোলে নিয়ে অমলেন্দু দাঁড়িয়ে আছেন। 'রাণী! ওকে ধর। পার্ক সার্কাস অঞ্চল থেকে সেপাইরা নিয়ে এসেছে। কারফিউর মধ্যে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। এখনও কথা বলতে শেখেনি। ওর বাবা-মায়ের খোঁজ এখনও পাইনি। মনে হচ্ছে ওর খিদে পেয়েছে। তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম। থানায়, অফিসের মধ্যে এই শিশুকে আমি কোথায় রাখব?'

অঘোরময়ী হাত বাড়াতেই শিশুটি ঝাঁপিয়ে কোলে চলে এলো। অমলেন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বাচ্চা ছেলেটি অঘোরময়ীর কোলে এসেই বুকের মধ্যে মুখ গোঁজার চেষ্টা করছে।

অঘোরময়ীর কোলের মেয়ে এখনও জাগেনি আর অঘোরময়ীর বুক টন্ টন্ করছে।

ছেলেটি পেটভরে দুধ খেয়ে কোলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ছোট মেয়ের পাশেই ওকে অঘোরময়ী শুইয়ে দিলেন। অঘোরময়ী ভাবলেন, ছেলেটির জাত তো জানা হল না। দুধের শিশুর আবার জাত কি এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বাচ্চা ছেলেটি অঘোরময়ীর বুক জুড়ে রইল। নিজেকে নিঃশেষ করে শিশুটিকে দুধ খাওয়ালেন। আর নিজের কোলের মেয়ে ঝিনুক বাটিতে ছাগলের দুধেই সন্তুষ্ট থাকল।

এই সাতদিনে ওই নাম না জানা শিশুকে অঘোরময়ী যে কত নামেই ডাকলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্নান করালেন, ভাত খাওয়ালেন, সাজালেন আর নিজের মধুভাণ্ড নিঃশেষ করে হাল্কা হলেন। ছেলেটি মাঝে মাঝে অঘোরময়ীকে আম্মা বলার চেষ্টা করেছে। ওর মুখে আম্মা শুনে অঘোরময়ী ভেবেছেন ও কি তবে...?

নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। ছেলেটিকে অঘোরময়ীর সন্তানদের থেকে আলাদা করার উপায় নেই। দেখে মনে হয় ওরই সন্তান। অমলেন্দু সাতদিনের মাথায় অফিস থেকে উপরে এসে বললেন— 'ওর বাবা-মায়ের খোঁজ এখনও পাইনি। না পেলে ওকে সরকারি আশ্রমে পাঠাতে হবে।'

'না! ও আমার কাছেই থাকবে।'— অঘোরময়ীর দীপ্ত ঘোষণা শুনে অমলেন্দু বললেন— 'তুমি তো ওর জাত জানো না। আর এমনিতেই আমাদের অভাবের সংসার, তার উপর আরও একজনের দায়িত্ব। আমার একার রোজগারে পেরে উঠব?'

'মা আর শিশুর কোনও জাত হয় না। আমাদের যা জুটবে তাই সবাই মিলে ভাগ করে খাব।'

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে অঘোরময়ীর এই নতুন রূপ দেখে অমলেন্দু চমৎকৃত।

এই কথোপকথনের এক বিন্দুও শিশুটিকে আকৃষ্ট করল না। পরম নিশ্চিন্তে অঘোরময়ীর বুকে মুখ গুঁজে মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল।

শিশুটি কিছুতেই অঘোরময়ীকে ছাড়তে চায় না। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও মায়ের গায়ের গন্ধ চায়। অথচ নিজের মেয়ে তখন অঘোরে ঘুমায়।

অমলেন্দু মাঝে মাঝে সাবধান করেন— 'মায়া বাড়িও না। পরের ছেলে। যে কোনও মুহূর্তে ফেরত দিয়ে দিতে হবে।' শুনে অঘোরময়ীর বুকটা কেঁপে ওঠে। একরত্তি ছেলেটার প্রতি এত মায়া, এত টান কেন? অমলেন্দু এই পরিস্থিতিতে অঘোরময়ীকে না জড়ালেই হোত।'

পায়েসের দুধ জ্বাল দিতে দিতে অঘোরময়ী আবার পিছিয়ে গেলেন প্রায় কুড়ি বছর আগের দিনটিতে। সেদিন সকাল থেকেই কোলের মেয়ের গা গরম। জ্বর হওয়াতে আরও নেতিয়ে পড়েছে। এদিকে বাচ্চা ছেলেটিও কোল থেকে নামবে না। অনেক কষ্টে দু'জনকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের কাজ শেষ করেছেন। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে

অঘোরময়ীর বুক কেঁপে উঠল। অজানা আশঙ্কা সকাল থেকেই তাঁকে কুরে কুরে শেষ করছে। দরজা খুলে দেখেন অমলেন্দু একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ফর্সা, সুপুরুষ ভদ্রলোকের মুখের অল্প চাপ দাড়ি। পরনে পাজামা, পাঞ্জাবী। চেহারায় স্বচ্ছলতার ছাপ স্পষ্ট।

অমলেন্দু বললেন— 'এই ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তানকে তুমি এতদিন তোমার সন্তানদের সঙ্গে পালন করেছ রাণী। এস আজ ওর ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে আমরা মুক্ত হই।'

'কি বলে আপনাদের ধন্যবাদ দেব জানি না। আমি মুসলমান। হিন্দুর ঘরে আমার ছেলে মায়ের স্নেহে এই ক'দিন প্রতিপালিত হয়েছে। আমি চিরজীবন আল্লার কাছে আপনাদের জন্য দোয়া করব। আমি ছেলেকে ফিরে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

অঘোরময়ী কোনও কথা বলতে পারেননি। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন— 'ও এখন ঘুমোচ্ছে। একটু বসুন। আমি ওকে খাইয়ে নিয়ে আসছি। ঘুম থেকে উঠলে খিদের জন্য কাঁদবে। তবে নিজের মায়ের কোলে ফিরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ওর মা ওকে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছেন। আমার দিদির দুই ছেলের সঙ্গে ও মানুষ হচ্ছে। ব্যবসার কাজে আমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। এই গণ্ডগোলের সময় কখন যে গেট খোলা পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে তা কেউ জানতেও পারেনি। খোদার মেহেরবানী আমার ছেলে আপনাদের কাছে বেঁচে আছে।'

শোবার ঘরে এসে ঘুমন্ত শিশুকে অঘোরময়ী কোলে তুলে নিলেন। চোখ খুলে অঘোরময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে শিশু একগাল হাসল। বুক টন্ টন্ করছে। দুধের বোঁটা ওর মুখে গুঁজে দিয়ে অঘোরময়ী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কান্নায় শরীর ফুলে ফুলে উঠছে, অথচ মুখে আওয়াজ করতে পারছেন না।

অমলেন্দু এ ঘরে এসে বললেন, 'রাণী আর দেরি করো না। দিনকাল ভালো নয়। ভদ্রলোককে পুলিশ প্রোটেকশানে পাঠাতে হবে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হল অমলেন্দুর। শিশুটিকে তার বাবার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ছোট মেয়েকে বুকে চেপে ধরে ওকে ভোলার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় লেগেছে স্বাভাবিক হতে। ইতিমধ্যে অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। স্মৃতি এখন অনেক ফিকে। নিজের ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। অমলেন্দুর চাকরী থাকতে বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

অবসর নেবার পর যেটুকু টাকা জমেছিল তাই দিয়ে এই বাড়িটা করা হয়েছে। ছেলে চাকরিতে ঢোকার পরে সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে।

পায়েসের রঙটা বেশ গোলাপী আভা ধরেছে। সম্পূর্ণা ঠিক এমনটাই পছন্দ করে। দেবার আগে ঠাণ্ডা করতে হবে। বরং চপটা গড়ে নিয়ে কুসুমকে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে দিতে বলবেন। ওরা যখন গল্প করবে তখন চপটা ভেজে ফেলবেন। তাহলে গরম গরম পরিবেশন করা যাবে।

হৈ হৈ করে সম্পূর্ণা বন্ধুদের নিয়ে ঠিক সন্ধ্যের মুখে ঢুকলো। অমলেন্দু সন্ধ্যা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বাড়িতে শুধু অঘোরময়ী রয়েছেন। বসার ঘরে বন্ধুদের রেখে সম্পূর্ণা ভিতরে এসে মাকে বলল— 'চল, আগে আলাপ করবে চল আমার বন্ধুদের সঙ্গে।'

'চপটা কখন ভাজব?' অঘোরময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

'একটু পরে ভাজলেও চলবে। এই তো সবে এসেছে।'

অভ্যেসমতো মাথায় ঘোমটা টেনে অঘোরময়ী বসার ঘরে এলেন।

'মা— এই যে ভাস্বতী, নূপুর আর বেবি। রথীনকে তো তুমি চেনো। আর ওই সিরাজ।'

ছেলেমেয়েরা একে একে অঘোরময়ীকে প্রণাম করল। উনি সবার চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। সবশেষে সিরাজ এসে একটু ইতঃস্তত করে প্রণাম করল।

অঘোরময়ী একটু পিছিয়ে থাক, থাক বলে উঠলেন।

'থাকবে কেন? আপনি মা। মাকে প্রণাম করব না?'

প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে ফর্সামুখে ডানদিকের কপালের উপর চুলের গোছাটা সরে গেল।

অঘোরময়ী দেখলেন কপালের উপর লাল রঙের খণ্ড ত (ৎ)-এর মতো জরুলটা। আকারে বড় হয়েছে।

স্নান করাবার সময় অঘোরময়ী জায়গাটা কতবার স্পর্শ করেছেন। এক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অঘোরময়ী জিজ্ঞাসা করলেন— 'তোমার বাবার নাম নূর মহম্মদ? তোমাদের বাড়ি পার্ক সার্কাসে ছিল? তোমার বাবার ব্যবসা আছে? তুমি ছোটবেলায় পিসির কাছে মানুষ হয়েছ?'

সিরাজ মাথা নাড়ল। ঘরের বাকি অতিথিরা অবাক হয়ে সম্পূর্ণার মাকে দেখছে। ঘোমটা খসে পড়েছে। দু-হাতে সিরাজের কাঁধ দুটো শক্ত করে ধরেছেন। দু-চোখে জল। অনেক কথা বলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু শব্দগুলোর একটিও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। অঘোরময়ী কুড়ি বছর আগে ফিরে গিয়েছেন। বুক টন্ টন্ করছে। এত বছর বাদেও মনে হচ্ছে ওর মুখটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরেন।

হারানো সন্তানের জন্য অঘোরময়ীর মধুভাণ্ডে ক্ষরণ শুরু হলো। ▯

শোভাবাজার রাজবাড়ির (রাধাকান্ত দেবের অংশ) ভগ্নপ্রায় বৈঠকখানা (দোতলায়)। ছবি : শিবু ঘোষ

বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা

অর্ণব নাগ

'সুবর্ণেতে বান্ধা যার বৈঠকীর ঘর'— কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল

সোনায় বাঁধানো বৈঠকখানা, সোনার কেল্লা কিংবা সোনার ছেলের মতোই অলীক হবে হয়তো। কিন্তু স্মৃতির সোনালীরেখায় বাঙালি-র বৈঠকখানা সতত বিরাজমান। প্লিজ, দু' কি তিন কামরার ফ্ল্যাটের ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুমকে আবার বৈঠকখানা ভেবে বসবেন না। বাঙালির স্মৃতিমেদুরতায় এমন বৈঠকখানা কস্মিনকালেও ধরা দেয় না। ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো, বাড়ির পূর্বপুরুষদের বড় বড় তৈলচিত্র টাঙানো, বইয়ের র‍্যাক কিংবা গোল টেবিল সম্বলিত বৈঠকখানা আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত। আমাদের বৈঠকখানার ইতিহাস কিন্তু সুপ্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে আসর জমানোর জায়গা হিসেবে বাত্যালক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বেষ্টিত স্থানকে বলা হোত বাত্যালক। অর্থাৎ বৈঠকখানার আদিপুরুষ হিসেবে 'বাত্যালক'কে চিহ্নিত করলে দোষের কিছু নেই। তাই বৈঠকখানার ইতিহাস যে বৌদ্ধযুগীয় আমল থেকে একথা বলা যায়। তবে মুসলমান আমলে এর কদর বাড়ে। নারীর সম্মানরক্ষায় পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি হতে অন্দরমহল-বাহিরমহল আলাদা হয়ে যায়। রাজ-রাজড়াদের আমলে সর্বসাধারণের জন্য যে দরবার বসতো, জমিদারি আমলে তাই বৈঠকখানার পূর্ণ রূপ নিল। তবে জমিদারবাবুদের বৈঠকখানায় সর্বসাধারণের নয়, কেবলমাত্র তাদের পেয়ারের লোকজন যেমন নায়েব গোমস্তা এবং মোসাহেবদেরই অধিকার ছিল আসর জমানোর। বাহিরমহল হিসেবে বৈঠকখানা বহুদিন পর্যন্ত বাড়ির মেয়েদের কাছে অচ্ছুৎই ছিল। তবে সামাজিক ছুঁৎমার্গের ব্যাপারটা বোধহয় বৈঠকখানায় ছিল না। নানা জাতের মানুষের জন্য কত ধরনের যে হুঁকো থাকতো সেখানে! বালক বিলে তো বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় সেইসব হুঁকো টেনেই কীভাবে জাত যায় তার পরীক্ষা করেছিল। বৈঠকখানাকে চিরসমাদৃত করে রেখেছে বৈঠকী আড্ডা ও গান। নিধুবাবুর টপ্পার কথা শোনেনি এমন বাঙালি এখনও জন্মেছে কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প তো জগৎবিখ্যাত। তবে বৈঠকখানা শুধু চার দেওয়ালেই আটকে থাকেনি, গোটা বাড়িটাই যে তার দখলে

চলে যেতে পারে, এমন ইতিহাসও উঠে এসেছে আলোচ্য নিবন্ধে। কিন্তু বৈঠকখানার আড্ডা প্রসঙ্গ সেভাবে আসেনি। বাঙালির নির্ভেজাল আড্ডা অনেক পরের ব্যাপার। আধুনিক বাঙালিও তাকে মনে রাখায় তার অস্তিত্বের সংকট সেভাবে আসেনি। কিন্তু বৈঠকখানা হারিয়ে গেছে।

বৈঠকী মেজাজের যে পরিচয় হীরেন্দ্র মল্লিক দিয়েছেন, সংক্ষিপ্ত আকারে তা তুলে ধরে মূল প্রবন্ধে প্রবেশ করবো— ''বৈঠকখানা থেকে বড়কত্তার ডাক, লক্ষীকান্তকে ডাক তো, ভান্ডারীর কাছে খবর নিই জন্মাষ্টমীর পিপুল আর গোলমরিচ এল কি না! সেজবাবু বৈঠকখানা থেকে হেঁশেলে খবর দিয়েছেন খিচুড়িতে যেন কাঁচা তেল পড়ে। মেজবাবু আবার শেক্সপীয়ারের ওথেলো ও ডেসডিমোনা লেদারে বাঁধাই কর্ণার সো-কেসে যত্ন করে তুলে রাখছেন। সেসব মথুর কাঠের মিস্ত্রিকে দিয়ে করানো। এক কর্তা হাবল-বাবলে ফুঁ দিয়ে হাঁক ছাড়ল, ওরে বংশী হুঁকোটা পাল্টে দে, বৈঠকখানার অসলার ঝাড় টিং টাং শব্দে আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে বেজেই চলছে। এক কর্তার হুকুম আবার মাদুরের। নিজেই কিনতে বেরিয়ে কিনে নিয়ে এলেন শতরঞ্জির পাহাড়। শ্রদ্ধেয় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের মেজাজ। অন্য এক বাবুমশায়ের কথা শুনেছিলাম, আহিরীটোলায় বিধুশেখরের চন্দ্রাবতী নাটকের শেষ সীনে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় প্রদীপের শিখা, তার রাঙা থমথমে মুখের লাবণ্য; সে মায়ার লাবণ্য বিধুশেখর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বৈঠখানায় বসে সে তাই ভাবছে।''

কলকাতার বৈঠকখানা

বৈঠকখানার ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণের সময় যে কলকাতার বৈঠকখানাটি তার স্বকীয় মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানার্জনের দাবি রাখবে সেই ইতিহাসের পাতায়, তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বিশেষত আধুনিক কলকাতার অন্যতম প্রাণপুরুষ জোব চার্ণকের কিংবদন্তী যখন এর সঙ্গে জড়িত, তখন প্রাচীনত্বের দিক দিয়েও এই বৈঠকখানাটি যে তার ইতিহাসের কালপ্রবাহে স্বয়ং দাদাঠাকুরের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বলাই বাহুল্য। কলকাতায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, বাইরে থেকেও যাঁরা কাজে কিংবা নিদেনপক্ষে বেড়াতেও এই মহানগরীতে পদার্পণ করেন, আজকের বৈঠকখানা অঞ্চল বা বাজার তাঁদের কাছে অজানা নয়। হতে পারে জায়গাটা পুঁতি থুড়ি শুঁটকি (মাছ) গন্ধময় কিংবা অপরিচ্ছন্ন ঘিঞ্জি; কিন্তু গোটা তিনেক কলেজ থাকার সুবাদে, কাগজপত্র কেনার পীঠস্থান হবার জন্য এবং সর্বোপরি পার্শ্ববর্তী শিয়ালদহ স্টেশনের কারণে কলকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলের আলাদা স্থানমাহাত্ম্য রয়েছে। আদ্যিকালের গ্রামাফোন, কাঠের প্রাচীন ফার্নিচার, পুরোনো বইপত্র কিংবা গাছপালা কেনার জন্যও কলকাতার বনেদী অধিবাসীদের কাছে জায়গাটার গুরুত্ব নেহাত কম নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জলপথই ছিল যোগাযোগের মূল মাধ্যম তখন কলকাতার বাবুঘাট অঞ্চলে চাঁদপাল ঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে একটি খাল বা নালা বেরিয়ে হেস্টিংস স্ট্রিটের ওপর দিয়ে, ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে সার্কুলার রোড পার হয়ে, এন্টালির উত্তর গা দিয়ে দক্ষিণমুখে গিয়ে বেলেঘাটার দক্ষিণে বাদা বা লবণহ্রদের ভেতর ধাপায় পড়ত। (তথ্যসূত্র : কলিকাতা দর্পণ, রাধারমন মিত্র)। এই খালের সৌজন্যেই তৎকালীন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হোত। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে যাঁদের বেলেঘাটায় নামতে হোত তাঁদের বিশ্রামস্থল ছিল পার্শ্ববর্তী একটি বট (মতান্তরে অশ্বত্থ) গাছ। যার নামই হয়ে গিয়েছিল 'বৈঠকখানা গাছ'। অনুমান বর্তমান শিয়ালদা স্টেশনের স্থানেই অবস্থিত ছিল এই গাছটি। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''... শিয়ালদহের নিকট ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'বৈঠকখানা বৃক্ষ'। পূর্বে এই স্থানে একটি বৃহৎ বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের শান্ত-শীতল ছায়ানত, নানাস্থানের ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ যাহারা পুরাকালের কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিত, মনের আনন্দে বিশ্রাম করিত। প্রবাদ আছে, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকও এই বৃক্ষতলে বসিয়া, বিশ্রামকালে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পাইপ টানিতেন। এ 'বৈঠকখানা-বৃক্ষ' বহুদিন লোপ হইয়াছে (রাধারমন মিত্র জানিয়েছেন, এই গাছটাকে কেটে ফেলা হয় এক মতে ১৭৯৯-এ, অন্যমতে ১৮২০-তে)। কিন্তু বৈঠকখানা নামটি আজও বর্তমান। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলেও (১৭৮৬-১৭৯৮) এইস্থান 'বৈঠকখানা' বলিয়া পরিচিত ছিল।'' (কলিকাতা, সেকালের ও একালের)

বোঝাই যাচ্ছে, বটমূলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসা মানুষের সমাগমে তা অচিরেই বৈঠকখানার রূপ নিত। সে কারণে ওই গাছটিই 'বৈঠকখানা বৃক্ষ' রূপে পরিগণিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, সেকারণেই জায়গাটির নাম হয় বৈঠকখানা। প্রাচীন কলকাতা শহরটিকে একটি বৃহৎ বাড়ি ভাবলে বৈঠকখানা অঞ্চলটিকে তার বৈঠকখানা হিসেবে মেনে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কলকাতার ইতিহাস রচনাকালে এই মূল্যবান তথ্যটিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করেছেন, ''এই বাজারটিই (বৈঠকখানা বাজার) কলিকাতা ভারতবর্ষে রাজধানী হইবার প্রধান আকর্ষণ। যে ফটক দিয়া ট্রাম গাড়ি শিয়ালদহ স্টেশনে যাতায়াত করে, সেই দক্ষিণ ফটকের সম্মুখে সার্কিউলার রোডের (অধুনা এপিসি রোড) চৌমাথার মধ্যস্থলে একটি বহুবিস্তীর্ণ বটবৃক্ষ ছিল। তাহার একটি শাখার নিম্নে খানা ছিল, আরেকটি শাখার নিম্নে একখানি ৭০ ফুট উচ্চ বৃহৎ রথ থাকিত। .... বাদা (সল্টলেক) পূর্বে সুগভীর থাকায়, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল হইতে বড় বড় নৌকায় নানাবিধ দ্রব্য আসিয়া বালিয়াঘাটায় পৌঁছিত, তথা হইতে বলদযোগে গোবিন্দপুর, চেতলা, সুতানুটি ও বাটোরের হাটে চলিয়া

যাইত। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র নৌকা ও তালডোঙ্গায় নিম্নশ্রেণীর বিক্রেতারা আসিয়া বালিয়াঘাটায় নামিত। এই সমস্ত বিক্রেতাদের সম্মিলন স্থান ছিল উপরোক্ত বৃহৎ বটবৃক্ষ। ইহার নিম্নে তাহারা দ্রব্যাদি নামাইয়া বিশ্রাম করিত, রন্ধনাদি করিত এবং সঙ্গীদিগের অপেক্ষা করিত। জোব চার্নক যখন হুগলীতে ছিলেন, তখনও মধ্যে মধ্যে এই বটমূলে আসিয়া দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী দেখিতেন এবং পাইপ খাইতেন। বেলী ও আপজন উভয়ের মানচিত্রেই উক্ত বৃটবৃক্ষের চিত্র ও বৈঠকখানা বাজারের স্থান উল্লিখিত আছে। বটবৃক্ষের অনুরোধে মহারাষ্ট্র খালকেও সরলরেখা ছাড়িয়া ওইখানে একটু বক্র হইতে হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেসলি সার্কিউলার রোড নির্মাণার্থে ওই বৃহৎ বটবৃক্ষ কাটিতে আদেশ দেন।" (কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, দেবাশিস বসু সম্পাদিত)।

রাধারমণ মিত্র অবশ্য বৈঠকখানা গাছের তলায় চার্নকের পাইপটানার কাহিনীটিকে স্রেফ 'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, জোব চার্নককে ঘিরে যে রাশি রাশি কিংবদন্তী কলকাতার সূচনালগ্নে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে এও একটা। যদিও 'বৈঠকখানা গাছে'র অস্তিত্ব শ্রীমিত্র অস্বীকার করেননি, তবে গাছটা তাঁর মতে বট ছিল না, ছিল অশ্বত্থ। 'কলিকাতা দর্পণ'-এ তিনি লিখেছেন, ''জোব চার্নক একটা গাছের নীচে বসতেন। শুধু বসতেন না, ইয়ার-বক্সী ও মক্কেলদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, কেনাবেচার কথাও বলতেন। আবার হুঁকো টানতেন। সেটি কোন গাছ? জোব চার্নককে আশ্রয় দিলে যদি সম্মান বৃদ্ধি হয় তাহলে এই সম্মান দাবি করে তিনটি প্রকান্ড গাছ। একটি অশ্বত্থ, একটি বট (শ্রী মিত্র জানিয়েছেন গাছটি ছিল চিৎপুর রোডের ধারে বটতলায়) আর একটি নিম (নিমতলায়)। সব ইংরেজ লেখকই গোড়ার দিকে অশ্বত্থ গাছটাকেই ভোট দিয়েছিলেন। সে গাছটা ছিল সার্কুলার রোড ও বৌবাজার স্ট্রিটের মোড়ের পূর্ব দিকে শেয়ালদা স্টেশন হাতার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলতেন, এই বটগাছটার জন্যই বৌবাজার স্ট্রিটের আগে নাম ছিল বৈঠকখানা স্ট্রিট। কারণ, ওই বিরাট অশ্বত্থ গাছটাই জোব চার্নকের বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হোত। একথাটা যে একেবারে গাঁজাখুরি, সেকথা পরবর্তীকালের ইংরেজরা বুঝেছিলেন এবং এই গাছের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন।" বিনয় ঘোষ লিখেছেন, ''শোনা যায়, বৌবাজারের এক অশ্বত্থগাছের তলা ছিল চার্নক সাহেব ও অন্যান্য বণিকদের বিশ্রাম নেবার বৈঠকখানা। বাজারের কাছে, শিয়ালদহ-বৌবাজারের মোড়ের মাথায় এই অশ্বত্থের ছায়ায় বসে জোব চার্নক কয়েকটি গ্রামকে কলকাতা শহরে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।" যদিও অতুল কৃষ্ণ রায় তাঁর 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এ এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব 'কলিকাতার ইতিহাস'-এ গাছটিকে বট বলেই চিহ্নিত করেছেন।

তবে বাঙালিবাবুর এই সর্বকালের সর্ববৃহৎ বৈঠকখানায় চার্নক ছাড়াও পরবর্তীকালে ইংরেজ সংযোগের আরও একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানেই ছিল সুপ্রাচীন একটি ট্যাভারন (ইংরেজদের জমায়েতের আড্ডা), যার নাম 'ব্রেড অ্যান্ড চিজ'। ১৭৮৪ সালের হিকির গেজেটে বৃটিশদের এই আড্ডাখানা বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখা যায়। যাই হোক, এই বৈঠকখানা চার্নকের উপস্থিতির সাক্ষী থাকুক আর নাই থাকুক, কিংবা পরবর্তীকালে বৈঠকখানা গাছটি কাটা পড়লেও বা এখানে ইংরেজদের আড্ডাখানাটি একদা লাটে উঠে গেলেও বাঙালির আদি-অকৃত্রিম বৈঠকখানা আজও

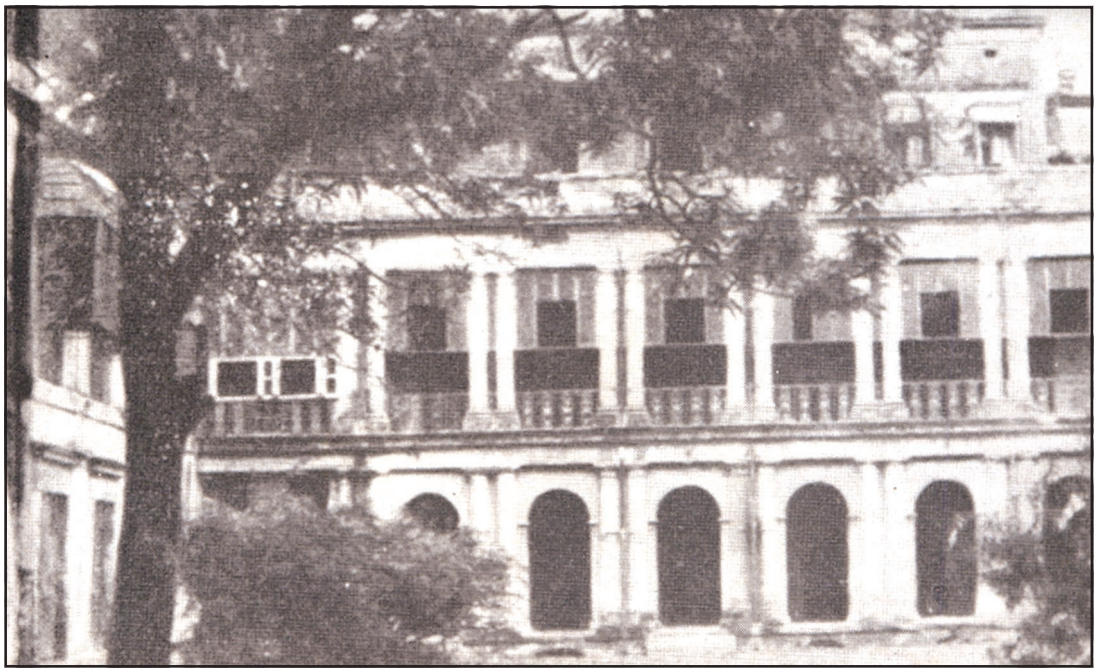

শ্রীল দ্বারকানাথের অধুনালুপ্ত বৈঠকখানা বাড়ি (চিৎপুর : ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন)।

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : gargasso@vsnl.com

Phone : 0120-2712128/2712039
Fax : 91-120-2712051

স্বমহিমায় বিরাজমান।

প্রিন্স দ্বারকানাথের বৈঠকখানা-বাড়ি

বঙ্গজ শিল্পোদ্যোগকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিয়ে যাবার মূল কারিগর দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সুনজরে দেখার নজির বাঙালির কোষ্ঠীতে লেখা নেই। দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে আমাদের মূল অভিযোগ— প্রথমত, তিনি ছিলেন চরম নাস্তিক মনোভাবাপন্ন। দ্বিতীয়ত, ম্লেচ্ছ সংসর্গে তিনি ডিরোজিওর ন্যায় হিঁদুয়ানীর বারোটা বাজিয়েছেন। তৃতীয়ত, বাবু-সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মদ-মাংস ভোজনে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতায় মদত দিয়েছেন ইত্যাদি। আমাদের এহেন ভাবনায় ইন্ধন যুগিয়েছেন স্বয়ং দ্বারকানাথ জায়া দিগম্বরীদেবীর স্বামীর সংস্পর্শ ত্যাগ, স্বীয়পুত্র দেবেন্দ্রনাথের পিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এবং সর্বোপরি পৌত্র রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মনোভাব। সব মিলিয়ে যে অন্যায়ের শিকার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হয়েছেন, তার বিচারের স্থান যদিও এটা নয়; কিন্তু তাঁর বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণের পেছনে যে অবিচারের অশ্রুবিন্দু লুকিয়ে রয়েছে তা সামান্য দীর্ঘ হলেও অন্তত বাঙালির বৈঠকখানার ইতিহাসের খাতিরে এখানে বিবৃত করা জরুরি। এতে পাঠক ধৈর্যচ্যুত হবেন না আশা করি। নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী তৎপ্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের ব্রাহ্মণ কান্ডের তৃতীয় ভাগে পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণের ১ম খন্ডে লিখেছেন, ''দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ হোম, তর্পণ, জপ করিতেন। অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে গৃহদেবতা লক্ষ্মী জনার্দন শিলার নিত্যপূজা করিতেন। যে পূজক নিযুক্ত ছিলেন, সে ভোগাদি পাক করিয়া ভোগ দিত ও আরত্রিক করিত। গায়ত্রী জপের প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল। সর্বদা তাহাকে গায়ত্রী জপে নিযুক্ত দেখা যাইত। কথোপকথনের অবসরে বিশ্রামকালে, আপিস যাতায়াতকালে গাড়িতে তিনি জপে নিযুক্ত থাকিতেন। জপে তিনি এতটা অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার করাঙ্গুলি সর্বদা জপসংখ্যা রক্ষা-মুদ্রায় দেখা যাইত। যখন জপ করিতেন না, তখনও তাহাকে 'কর ধরিয়া' থাকিতে দেখা যাইত। শেষে যখন মধ্যবয়সে তাহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠতা হইল, তখন তিনি একেশ্বরবাদে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু দেবতা পূজায় বা জপে তাহার কিছুমাত্র ভক্তি কমে নাই। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভায়, আত্মীয় সভায় ও উপাসনাসভায় তিনি যে ভক্তিমান হৃদয়ে যোগ দিতেন, প্রত্যহ গৃহদেবতার পূজার জপে, হোমে তাহার সে একনিষ্ঠ ভক্তি সমান বর্তমান দেখা যাইত। তাহার পর যখন সাহেব-মেমদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, তাহার বেলগাছিয়ার বাগানে (রাধারমন মিত্রের মতে ১৮৩৬ বা তারও আগে এই বাগানবাড়ি যা বেলগাছিয়া ভিলা

কাঁটালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা বাড়ি। অধুনা ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় পর্যবসিত। ছবি : নির্মল সাহা

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

NITIN ENTERPRISES

Manufacturers :-

ALUMINIUM ALLOYS, ZINC ALLOYS &
BRASS ALLOYS

Nitin Enterprises
D-138-A, Phase - V, Focal Point
Ludhiana - 141010

PHONES : Off. 2676985, RESI. : 2505596

দেওয়ান রামলোচন ঘোষের বাড়ির বৈঠকখানা। ছবি : শিবু ঘোষ

নামে খ্যাত তা নির্মিত হয়) খানা চলিতে লাগিল, তখন প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ খানার টেবিলে বসিতেন না, দূরে দূরে থাকিতেন এবং খানার শেষে গঙ্গাজলাদি স্পর্শ ও ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতেন। যতদিন এইভাবে চলিয়াছিল, ততদিন তিনি নিজে দেবপূজা করিতেন, কিন্তু যেদিন হইতে নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন এবং নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্যের জন্য অর্থাৎ পূজা হোম তর্পণ, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেতনভুক ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শুনা যায়, তাহার এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ১৮ জন ছিল। এই সময় হইতে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন না, পূজা-পার্বণে ঠাকুর দালানে উঠিতেন না, সাধারণ দর্শকের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া দেবদেবী দর্শন করিয়া প্রণামাদি করিতেন। এই সময় হইতে তাহার পরিবারস্থ মহিলারা এমনকী তাহার পত্নীও (দিগম্বরীদেবী) তাহার সহিত একাসনে বসিতেন না, হঠাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। এই সময়ে দ্বারকানাথের জ্ঞাতিগণ তাহার ভ্রষ্টাচারের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হন। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরবংশীয় হরকুমার, কানাইলাল প্রভৃতি সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করাই স্থির করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ইহা অবগত হইয়া তাহার পৈতৃক ভদ্রাসনের পার্শ্বে এক বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন এবং এই নতুন বাড়িতেই থাকিতেন। এই সময়েও অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেও দ্বারকানাথ গায়ত্রী জপ পরিত্যাগ করেন নাই।"

নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফী তাঁদের এ সংক্রান্ত বইটিতে আরও জানিয়েছেন, ১৮৪২ সালের শেষে দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর ভাগ্নে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথমবার ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা একই সঙ্গে বৈঠকখানা বাড়িতে থাকতে শুরু করলে চন্দ্রমোহনের বাসের জন্য বৈঠকখানার ওপর ঘর ওঠে। অনুমান করি বৈঠকখানাটি দোতলা থেকে তিনতলা হয় সেইসময়ই। ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট ইতিহাসকার হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''... (দ্বারকানাথ) সামাজিক সম্মেলনের জন্য জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গনে একটি বিশাল তিনতলা বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন; সেটি 'বৈঠকখানা বাড়ি' হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত হয়। নিছক আমোদ-প্রমোদ নয়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা হিসেবেই এইসব গণ্য হোত, এমনকী সেসব সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে উঠত। অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন সরকারের ঊর্ধতন রাজপুরুষ সহ কলকাতার তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।" (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি : হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল প্রবন্ধ : দ্য হাউজ অব দ্য টেগোরস, অনুবাদ : প্রভাত কুমার দাস)

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা কেটেছে এ বাড়িতেই। তিনি লিখেছেন, ''প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি। পূর্বপুরুষদের বিরাট চকমিলান ছয় নম্বর বাড়ি ছিল অন্দরমহল আর ওই বৈঠকখানা

SAHARA®

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :

SAHARA Electrical Appliances

D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961

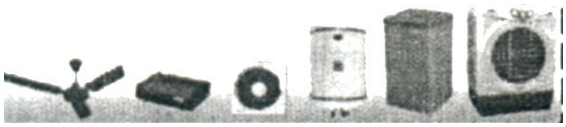

Phone : 0120-2820620
2820653
Fax : 2820653

LAW & MANAGEMENT
HOUSE
LAW PUBLISHERS

R-15/5, Raj Nagar,
Ghaziabad - 201001
Post Box 1, (U.P.)

Chander Bhan
Suraj Bhan

Phone : (O) 2461423, 3294291, (F) 2850492
Mob. 9319224997
Tele Fax : 2461423, (STD-0562)

AMAR MARKET,
JOHRI BAZAR, AGRA-3

Manufacturers of

All Kinds of Handloom,
Durries and Carpets etc.

New
Always Use
SKIN PLUS
Fresh Glow
Evani
NEEM LIME

ALL SEASON FAIRNESS CREAM

Toni International
Delhi - 52
Office : 2376 2677, 2353 1365

Get 40gms. at Price of 30ms.
FREE 10g.

গোকুল মিত্রের বাড়ির গৃহদেবতা মদনমোহনের সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা। ছবি : শিবু ঘোষ

বাড়ি ছিল বাহির-মহল। ওখানে বাড়ির মেয়েদের প্রবেশ ছিল না। ওটি তৈরি করেছিলেন দ্বারকানাথ নিজে তার দেশী-বিদেশী আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের প্রচুর আড়ম্বরে আপ্যায়ন করবার জন্য।" (দক্ষিণের বারান্দা, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। এই বৈঠকখানা বাড়ি সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন দ্বারকানাথের জীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালিনী, ''উপার্জন ও সঞ্চয়ের কাজে দ্বারকানাথ অক্লান্তকর্মা ছিলেন, তেমনি অক্লান্ত ছিলেন তিনি জীবন-সম্ভোগে। গোঁড়ামির বিধিনিষেধ তিনি বড় একটা না মেনে নিলেও, তাঁর নিজের মধ্যেই একটা নৈতিক সংযম ছিল। তাছাড়া অপরের অনুভূতি অযৌক্তিক হলেও তিনি তাকে সম্মান দিতেন, কারও মনে আঘাত দিতে চাইতেন না। সুতরাং তাঁর নিজস্ব জীবনচর্যার স্বাধীনতা থাকে অথচ তা থেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার মনোকষ্ট না পান— সেই উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি একটা সময়ে শহর কলকাতার উত্তরাঞ্চলে দমদম যাবার পথে বেলগাছিয়ায় বিস্তীর্ণ বাগান সমেত বিরাট এক ভিলা তিনি ক্রয় করেন। কিন্তু সেখানে তিনি যেতে পারতেন কালে-ভদ্রে। কাজ-কারবার প্রধানত কলকাতা শহরেই ছিল বলে তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসনের পাশে এক বিরাট ত্রিতল বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করালেন। বেলগাছিয়া ভিলা ও জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানা বাড়ির স্থপতি ছিল ইংরেজ। বাড়ির মহিলারা ও পরিবারের জ্ঞাতিগণ ভ্রষ্টাচারের জন্য তাঁকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন জানতে পেরে দ্বারকানাথ নবনির্মিত বৈঠকখানা বাড়িতে উঠে যান।" (দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিস্মৃত পথিকৃৎ : কৃষ্ণ কৃপালিনী, অনুবাদ : ক্ষিতিশ রায়)। প্রসঙ্গত, দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'বেলগাছিয়া ভিলা'য় ছিল সেকালের নতুন ইউরোপীয় আসবাব, চিত্র ও ভাস্কর্যে সাজানো চমৎকার এক বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পেছনে মার্বেল পাথরের ফোয়ারা যে এর শোভাবর্ধন করতো তা বলাই বাহুল্য। (বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

দিদিমা অলকাসুন্দরী (দ্বারকানাথের মা)-র মৃত্যুর পর পৌত্র দেবেন্দ্রনাথের মনে যে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়েছিল তার পটভূমিকায় এই বৈঠকখানা বাড়ির গুরুত্ব বলে বোঝাবার নয়। এখানে দেবেন ঠাকুরের অবাধ গতিবিধির কথা তাঁর 'আত্মজীবনী'র সুবাদে আমাদের জানা। এই 'আত্মজীবনী'-তেই দেখা যায়, আধ্যাত্মিকতার চরম উপলব্ধিতে একবার (১৮৩৬-৩৭ সাল নাগাদ) বৈঠকখানা বাড়িটিতেই 'কল্পতরু' হয়ে বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র দানছত্র করেছিলেন তিনি। আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধরা রয়েছে দেবেন্দ্রনাথের সেই সাক্ষ্য, ''দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, 'আজ আমি কল্পতরু হইলাম, আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা কিছু চাহিবে, তাহাকে আমি তাহাই দিব।' আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ব্রজবাবু বলিলেন যে, 'আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দিন, ছবিগুলান দিন, ঐ জরির পোষাক দিন।' আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সকলই দিলাম। তিনি পরদিন মুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর বহুমূল্য গৃহসজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। এইরূপ আমার সকল আসবাব

বিলাইলাম।"

১৮৪৬ সালের ১ আগষ্ট লন্ডনে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুসারে বৈঠকখানা বাড়িটি ভাগে পান তাঁর মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তথ্য, ''দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভাইদের সঙ্গে একসঙ্গে ছয় নম্বর বাসভবনে বাস করতেন। দ্বারকানাথের মেজছেলে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৮৫৪) পর তাঁর বিধবা বৈঠকখানা বাড়ি পাঁচ নম্বর বাসভবনে উঠে যান।" বলাই বাহুল্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর বংশধররা বাস করতে লাগলেন ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের আদি বাসভবনে। অন্যদিকে ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বৈঠকখানা বাড়িই গিরীন্দ্রনাথের বংশধরদের কাছে বসতবাটিতে রূপান্তরিত হলো। বাড়িটা প্রস্তুত হয়েছিল বৈঠকখানা হিসেবে। সুতরাং অন্তরের আবডাল তাতে অনাবশ্যকই শুধু নয়, অবাঞ্ছনীয়ও ছিল। এহেন বাড়িকে বসতবাটিতে পরিণত করতে গেলে অন্দরমহলের পর্দা যে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী! এই বাড়িরই মানুষ অবনীন্দ্রনাথ সে সমাধানের কথা তাঁর 'আপন কথা' গ্রন্থে আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন, ''এ বাড়িটা বৈঠকখানা হিসেবে প্রস্তুত করা— এটাকে আমাদের বসতবাড়ি হিসাবে করে নিতে এখানে ওখানে নানা পর্দা দিতে হয়েছে, না হলে ঘরের আব্রু থাকে না। বৈঠকখানায় বাস করতে হবে মেয়েছেলে নিয়ে, সেটা একটা দুর্ভাবনা জাগিয়েছিল নিশ্চয়; তাই কতকগুলো পর্দা ঝিলমিল ও চলাফেরার নিয়ম দিয়ে বাড়ির কতক অংশ, পুরনো বাড়ি ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্দর হিসেবে দেওয়াল ঝিলমিল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে নিতে হয়েছিল আব্রুর জন্যও বটে, বাস-ঘরের অকুলানের জন্যও বটে। এবং সেই পর্দা দেওয়াল ইত্যাদি ওঠার সঙ্গে কতকগুলি জানালা-বন্ধ, দরজা-বন্ধ নিয়মও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আপনা হতেই।"

তবে ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের এই বসতবাটী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে। গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ, যিনি নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে হিন্দুমেলার সহ সম্পাদক ছিলেন এবং গুণেন্দ্রনাথ যিনি নিজে ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও পরবর্তীতে তাঁর পুত্ররা গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র এবং কন্যা সুনয়নীদেবীর চিত্রকলার নতুন দিগন্ত উন্মোচন বঙ্গীয় রেনেসাঁকে শৈল্পিক পথে চালিত করেছিল। শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান এই বসতবাটীতে কিন্তু গড়ে উঠেছিল একটি স্বতন্ত্র বৈঠকখানাও। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (রাণী চন্দ অনুলিখিত) গ্রন্থে যার বহুমুখী পরিচয় দিয়েছেন। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দোলের উৎসব। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''দোতলায় বাবামশায়ের বৈঠকখানায়ও হোলির উৎসব হোত। সেখানে যাবার হুকুম ছিল না। উঁকিঝুঁকি মারতুম এদিক ওদিক থেকে। আধ হাত উঁচু আবিরের ফরাস। তার উপরে পাতলা কাপড় বিছানো। তলা থেকে লাল আভা ফুটে বের হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব এসেছেন অনেক— অক্ষয়বাবু তানপুরা হাতে বসে, শ্যামসুন্দরও আছেন। ঘরে ফুলের ছড়াছড়ি। বাবামশায়ের সামনে গোলাপজলের পিচকারি, কাঁচের গড়গড়া, তাতে গোলাপজলে গোলাপের পাঁপড়ি মেশানো, নলে টান দিলেই জলে পাঁপড়িগুলো ওঠানামা করে। সেবার এক নাচিয়ে এল। ঘরের মাঝখানে নন্দ ফরাস এনে রাখলে মস্ত বড়ো একটি আলোর ডুম। নাচিয়ে ডুমটি ঘুরে ঘুরে নেচে গেল। নাচ শেষ হলো, পায়ের তলায় একটি আলপনার পদ্ম আঁকা। নাচের তালে তালে পায়ের আঙুল দিয়ে চাদরের নীচের আবির সরিয়ে সরিয়ে পায়ে পায়ে আলপনা কেটে দিলে। অদ্ভুত সে নাচ!"

তবে শুধু উৎসবেই বোধহয় বৈঠকখানা বাড়ির বৈঠকখানার স্বার্থকতা নয়। বাড়ির চরিত্র মেনেই সেই বৈঠকখানা উদ্ভাসিত হয়েছিল শিল্পকলার আলোকে। অবন ঠাকুর তার সাক্ষ্য দিয়েছেন অত্যন্ত বিচিত্রভাবে, ''বৈঠকখানাতেই একদিন আমি আবিষ্কার করলুম 'লন্ডন নিউজে'র ছবি। বাঁধানো 'লন্ডন নিউজ' পড়ে ছিল এক কোণায়। সবকিছু ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে গিয়ে বইয়ের ভেতরে ছবির সন্ধান পেলুম। সে কতরকম কান্ড-কারখানার ছবি, নিবিষ্ট মনে বসে বসে দেখি।" একলা থাকার অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে যে বৈঠকখানার একটি মনোরম বর্ণনাও মিলেছে, ''বৈঠকখানা শোনশান, একলা আমি সেখানে পড়ে থাকি। থেকে থেকে দাদাদের ডেকসোর ঢাকা তুলে দেখি ভিতরে কী আছে। ... বাবামশায়ের (গুণেন্দ্রনাথ) টেবিলটা দেখি। কতরকম রঙ তার ওপরে সাজানো। একটি ক্রিস্ট্যালের কলমদানি ছিল, ঠিক যেন সমুদ্রের ঝিনুক একটি।.... বাবামশায়ের টেবিলে সেই কলমদানিতে কলম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেটাতে একবার হাত বুলোই, আবার এসে শুয়ে থাকি। তাও কোথায় শুয়ে থাকতুম জান? বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে। মাকড়সার জাল, ধুলো বালি কত কী সেখানে।" এই বাড়িতেই মানুষ হওয়া বিনয়িনীদেবীর কন্যা প্রতিমাদেবীর 'স্মৃতিচিত্রে'ও ধরা দিয়ে গিয়েছে সেই বৈঠকখানা।

তবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ৬ নম্বর বাড়িটা আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান থাকলেও ৫ নম্বর বাড়িটা হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। এর দুঃখজনক পরিসমাপ্তি পাঠকহৃদয়কে নিঃসন্দেহে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ''বর্তমান শতাব্দীর (বিংশ শতাব্দীর) চতুর্থ দশকের শুরুতে এই অট্টালিকা বন্ধকী মামলার রায় অনুসারে বহিরাগত ক্রেতার হাতে চলে যায়। অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন নিগ্রো সৈনিকদের বাসের জন্য সরকার ভারতরক্ষা আইনের বলে বাড়িটি হুকুম দখল করেন। পরে এটি খাদ্যশস্য মজুতের ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইতিমধ্যে এই বাড়ির মালিকানা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি সমিতি', যা স্থায়ীভাবে 'রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি' নামে পুনর্গঠিত হয়েছে, তাঁদের হাতে যায়। হুকুমনামা

উঠে গেলে তাঁরা কী ভেবে এই বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তাই সে বাড়িটি আজ নিশ্চিহ্ন। উত্তরে বিচিত্রাভবন, দক্ষিণে রবীন্দ্রস্মৃতিভবন যা বর্তমানে 'রথীন্দ্র মঞ্চ', এর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটিতেই এই বাড়িটির অবস্থান ছিল। বর্তমানে সেটি ঘাসে ঢাকা সবুজ প্রাঙ্গনে পরিণত হয়েছে।" ('জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি')।

এই ক্ষমাহীন অপরাধের জন্য কৃষ্ণ কৃপালিনীর ধিক্কার আমাদের প্রাপ্য, ''বাঙালি যে আত্মবিস্মৃত জাতি, বাঙালির ইতিহাস চেতনা বলতে যে কিছু নেই, বাঙালি যে কালাপাহাড়ি নির্মমতায় নিজের ঐতিহ্য ধ্বংস করতে উদ্যত— তার প্রমাণ মেলে পাঁচ নম্বরের পরবর্তী ইতিহাস থেকে।" ('দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ') তবে দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়ি আজ না থাকলেও বাড়ির স্মৃতি ধরা রয়েছে উত্তরপুরুষদের লেখায়। গগনেন্দ্র কন্যা পূর্ণিমাদেবী ও অবনীন্দ্র-কন্যা উমা দেবী তাঁদের পিতৃদেব সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এই বাড়ির ছবি। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আপন কথা'। গুরুদেবের নির্দেশে রানী চন্দের কাছে এই বাড়ি আর তার মানুষজনদের সম্পর্কে যে অসামান্য স্মৃতিচারণা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তা লেখা রয়েছে, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' ও 'ঘরোয়া' গ্রন্থে। তাঁর দৌহিত্রদ্বয় মোহনলাল-শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের এ বাড়ি সম্পর্কে স্মৃতিচারণা আজ দুর্লভ নয়। একটা কথা হলফ করেই বলা যায়, যতদিন শিল্পকলার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রর নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে লেখা থাকবে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি তীর্থক্ষেত্র পর্যটনে আসা মানুষজন জানতে চাইবেন কোথায় থাকতেন এঁরা? আর এঁদের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকবে ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ির স্মৃতি।

ঋষি বঙ্কিমের বৈঠকখানা বাড়ি

বাঙালির বৈঠকখানার ইতিহাসে এ বাড়ির কথা চিরকাল লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। কাঁটালপাড়ায় মূল গৃহ থেকে একটু দূরে দক্ষিণ দিক বরাবর ১৮৬৬ সাল নাগাদ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় উদ্যোগে ও খরচে কাদা মাটির গাঁথনিতে গড়া তিনকামরার একটি পুবমুখো বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর। তাই একটু বিস্তারিতভাবেই দেখে নেওয়া যেতে পারে তাঁর রচনায় এই বৈঠকখানার অভূতপূর্ব বর্ণনা— ''মন্দিরটির (বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বাড়ির আটচালার পশ্চিমের শিবমন্দির) দক্ষিণদিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে একটি ঘর। তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফরসি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশলাই ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণবভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণদিকে শিবমন্দির সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্বদিকে দু'টি দরজা একেবারে খোলা জমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিমদিকে দুটি জানালা, ঘরটি খুব পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি যতখানি লম্বা, ঘর দুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পুবের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পুবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই-একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখনও কখনও সে ঘরটিতে দুই-একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানজোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়াম থাকিত। দালানের উত্তরদিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।" (বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ, 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈঠকখানা বাড়ির অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। বাড়ির 'বৈঠকখানা' নাম সার্থক করে এর বড় ঘরটিতে বসতো 'বঙ্গদর্শনে'র মজলিস। বাঙালির চিন্তা ও মননকে পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ করতে সেইসময় যে মাসিক সমালোচক পত্রিকাটির কোনও বিকল্প ছিল না, তারই আঁতুড়ঘর হিসেবে চিরস্মরণীয় সাহিত্যসম্রাটের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা বাড়ি। বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র মজলিশে মধ্যমণি থাকতেন তাঁর মধ্যমাগ্রজ সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁরা ছাড়াও 'বঙ্গদর্শনে'র আঁতুড়ঘর আলো করে বসতেন দীনবন্ধু নিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রাজকৃষ্ণ রায়, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহ আরও অনেকে। এই মজলিশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে বৈঠকখানাবাড়িটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একটা ফুলবাগানের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, পূর্বোক্ত রচনায় তা জানিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিমী ছোঁয়ায় সেই ফুলবাগানের ফুলের মৌতাত মাতিয়ে দিত বৈঠকখানাটিকে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা, ''তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণদিকে দেখা যাইত একটি ছোট্ট ফুলের বাগান। দু-কাঠাও পুরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা। আড়েও প্রায় ওইরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নিচে একটি বেঞ্চি। চারদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথান, হাতখানেক উঁচা, তাহারও আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উঁচা, তাহারও মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উঁচা, চারদিকেই যেন গ্যালারি মতো। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারদিকেই টব সাজানো থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে সুরকির কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকি জমিতে জুঁই জাতি কুঁদ মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে

With Best Complements From

AN ISO-9001 CERTIFIED COMPANY

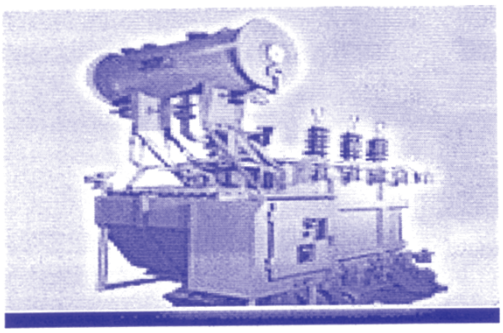

EIU EIU

[redacted]

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটিকে খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।" (সূত্র : তদেব)। নিজের বৈঠকখানার ওপর এহেন পক্ষপাতিত্বেই কিনা কে জানে বঙ্কিমী উপন্যাসে আর যাই হোক, বৈঠকখানা দুর্লভ নয়!

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না থাকলে বৈঠকখানা ঘরটি বন্ধই থাকত। ১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্কিম-জায়া রাজলক্ষ্মী দেবী মাঝে মধ্যেই এখানে এসে থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে (২৬ জুন) খুলে দেওয়া হোত 'বঙ্গদর্শন'-এর স্মৃতিমাখা বৈঠকখানা ঘরটি। শ্রদ্ধা জানাতে প্রচুর লোকসমাগমও হোত। বাকি সময় বন্ধই থাকত বাড়িটা। স্বাভাবিকভাবেই কাদামাটির গাঁথনির বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা বাড়িটা ক্রমশ জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর বছরখানেক আগে ১৯১৮ সালে রাজলক্ষ্মীদেবী বাড়িটিকে একবার মেরামত করান। ১৯১৯ সালে তাঁর মত্যুর পর বলাই বাহুল্য বাড়ির হাল আরও খারাপ হয়। ২৬ ফাল্গুন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (মার্চ, ১৯৪০) এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর পুত্র ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বৈঠকখানা বাড়ির নিজের ভাগের এক চতুর্থাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করেন। কাঁটালপাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ইতিপূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের কাছ থেকে ওই বাড়ির যে ত্রি-চতুর্থাংশ কিনেছিলেন তা সাহিত্য পরিষদকে দান করেন। পরে সাধারণের অর্থে এই বৈঠকখানা বাড়ির আমূল সংস্কার করা হয়।

তা সত্ত্বেও বাঙালির 'আত্মবিস্মৃত' বদনাম ঘোচবার নয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় (পবিত্র দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটি আসিয়া) বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় মার্বেল ফলক লাগাইয়া, উহা যে পুরাতন কীর্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং উহা যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র-২, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড)। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, পরবর্তীকালে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের নিজ খরচ ও স্বীয় উদ্যোগে লাগানো ওই ফলকটি বেমালুম উধাও হয়ে যায়। এই চুরিতে বাঙালির ঐতিহ্যহানি করা ছাড়া চোরের আর কী লাভ হয়েছিল ভগবান জানেন। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়ে লর্ড কার্জন কতটা নিন্দনীয় হয়েছিলেন বঙ্গ ইতিহাসে সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু স্রেফ একটাই কারণে বাঙালি কার্জনকে ক্ষমা করে দিতে পারে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটেমাটির অনেকাংশই রেলওয়ের করাল গ্রাসে গেলেও কার্জনের হস্তক্ষেপেই বঙ্গ রেনেসার গন্ধবাহী তাঁর বৈঠকখানা বাড়িটি সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করেছিলেন, "এই যে গৃহ (বৈঠকখানা বাড়ি), যেখানে বসিয়া তাঁহার বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, যেখান হইতে বিষবৃক্ষ তাহার অমৃতময় ফল সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, যেখান হইতে কোকিলের কুহুস্বর রোহিনীকে উন্মাদিনী করিয়া দেশসুদ্ধ উন্মাদ করিয়াছে, সেই সুরম্য স্মরণীয় গৃহে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতির কোনও চিহ্নই নাই।" (বঙ্কিমচন্দ্র-১, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড)। দায়িত্ব পেলেও সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে নৈহাটির কাঁটালপাড়ায় গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করার। তবে পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবছর নিয়ম করে বঙ্কিম-জয়ন্তী পালিত হোত। অবশেষে ১৯৫৪ সালে মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে পরিষদের হাত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিধন্য এই বৈঠকখানা বাড়ির কর্তৃত্ব বর্তায় রাজ্য সরকারের ওপর। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মারক সামগ্রী দিয়ে এখানেই গড়ে তোলা হয় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' যা অদ্যাপি বিদ্যমান। (এই বৈঠকখানা বাড়ির ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য বিজলি সরকার বিরচিত 'বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের কথা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার ওপর নির্ভর করেছি)।

প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের বৈঠকখানাবাড়ি

কলকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর বৈঠকখানার ইতিহাস বেশ পুরনো। এঁদের আদি পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর (আসল পদবী কুশারী)-এর দুই পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ আমিনীকার্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে ধনসায়রে (আজকের ধর্মতলা অঞ্চল) বাড়ি, বাগানবাড়ি এবং জমিজমার পাশাপাশি একটি বৈঠকখানাও নির্মাণ করেছিলেন। তখন সবেমাত্র জোব চার্নক আধুনিক কলকাতার গোড়াপত্তন করেছেন। পরবর্তী সময়ে ১৭৫৭ সালে নতুন অর্থাৎ বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ওই অঞ্চলে ঠাকুরদের অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে সেই বৈঠকখানাটিকেও অধিগ্রহণ করে। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)।

পাথুরেঘাটার ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র কালীকুমার ঠাকুর (গোপীমোহনের পুত্র) নাপতেহাটায় (পরবর্তীতে ২৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিট) একটি তেতলা বাড়ি নির্মাণ করান। তিনি মৃত্যুকালে (মৃত্যু ১৮৪০) তাঁর কনিষ্ঠ অনুজ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রসন্নকুমারকে এই বাড়ি দিয়ে যান। এই বাড়ি পাবার পর প্রসন্নকুমার বেশিরভাগ সময় এখানেই বাস করতেন। একে তিনি তাঁর বৈঠকখানা বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করতেন। (তথ্যসূত্র : কলিকাতা দর্পন, ২য় খণ্ড, রাধারমন মিত্র)।

তবে বাড়িটা খুব পাকাপোক্ত ছিল এমনটা বলা যাবে না। অন্তত প্রসন্নকুমারের বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহারের সময়। সংবাদ প্রভাকরে খবর বেরোয়, "শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটী মেরামত হইতেছিল, গৃহ নির্মাতা সাহেব দোতালা

গৃহের একটা প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া লোহার থাম দিয়া তেতলার ঘর রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহর একঘটিকার তময়ে ওই থাম পতিত হওয়াতে গৃহের অধিকাংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে একজন কর্মচারীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। অপর কয়েক ব্যক্তি গুরুতর আঘাত পাইয়াছে।" (সংবাদ প্রভাকর, ২ ফাল্গুন, ১২৬১)।

রাজা রামমোহনের অনুগামী প্রসন্নকুমার সমাজ সংস্কার সহ বহু সামাজিক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তার কোনও কিছুই এই বৈঠকখানা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়নি বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু সে ইতিহাস কেউ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেননি। ১৮৬৮ সালে এবাড়িতেই প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো যতীন্দ্রমোহন এই সম্পত্তির মালিক হন। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর নাগাদ এই বাড়ি ভেঙে ফেলে স্থাপত্যশৈলীর সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 'টেগোর ক্যাসেল' তৈরি করেন যতীন্দ্রমোহন। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার ২৪ অক্টোবর, ১৮৯৫ তারিখের সংবাদে লেখা হয়, "Maharaja Sir Jatindro Mohan Tagore has made a new departure in the way of buildings for the residence of native nobleman in India by having his old Baithakkhana or Summer residence changed so as to represent on English Castle"। এই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট পিতৃব্য প্রসন্নকুমারের কাছ থেকে পাওয়া এই পুরনো বৈঠকখানা বাড়ি বা নিজের গ্রীষ্মাবাসটিকে বৃটিশ দুর্গের রূপ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন। পরবর্তী সময়ে এটি ঠাকুর এস্টেটের কাছারিবাড়ি রূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁদের জমিদারির কাজকর্ম হোত এখানে। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয় প্রসন্নকুমারের বৈঠকখানা। সে ইতিহাসও বিপন্ন হয়েছে। ১৯৫৪ সালে মুন্দ্রারা এই বাড়ি কিনে নেওয়ায় স্থানীয় মানুষজনের কাছে এটি এখন 'মুন্দ্রা ক্যাসেল'। ঠাকুরদের কোনও অস্তিত্বই নেই এখানে।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রগতির পীঠস্থান

এব্যাপারে প্রথমেই নাম করতে হয় রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির বৈঠকখানাটির। নবজাগরণ পর্বে যখন নারীশিক্ষা আন্দোলনের প্রবল আলোড়ন উঠেছিল তখন কলকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানাতেই। বিদ্যাসাগর অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, ''সর্বাগ্রে কলিকাতা সুকিয়া স্ট্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। সাহেব (বেথুন) প্রতিদিন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন" (বিদ্যাসাগর জীবনচরিত')। বেথুন ছাড়াও তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট মস্তিষ্কদের যেমন স্যার রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখের পদধূলি পড়েছিল দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানার বালিকা বিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে যা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নামে বেথুন স্কুল ও কলেজ হিসেবে মহীরূহের আকার ধারণ করে। কিন্তু চিরকালের জন্য অন্তরালে চলে যায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম আর সেই মহীরূহের ধাত্রীভূমির কথা।

বাবু-কালচারের যাবতীয় গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছিল রামদুলাল দে-র দুই সুযোগ্য পুত্র ছাতুবাবু (প্রকৃত নাম আশুতোষ দেব) এবং লাটুবাবু (প্রকৃত নাম প্রমথনাথ দেব)-র বিডন স্ট্রীটের বাড়ির বৈঠকখানাটি। এই বৈঠকখানার আড্ডার কথা একসময় কলকাতার লোকের মুখে মুখে ফিরত। এঁদের বৈঠকখানায় সাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকারের কথা জানা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই লোকমুখে এনিয়ে বেশকিছু ছড়া প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তার একটা হলো, ''ছাতুবাবুর (লাটুবাবুর) বৈঠকখানা— আজ বলেছে যেতে, পানসুপারি খেতে।" আরও একটা রয়েছে, 'এলাটিং বেলাটিং মাইপো ডিপো। চুলটানা বিবিয়ানা, (ছাতুবাবু) লাটুবাবুর বৈঠকখানা।' 'বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি'তে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বাঙালির আড্ডার ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয় তা হলে ছাতুবাবু-লাটুবাবুর এই আড্ডার কথা না লিখলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তদানীন্তন সিমলার এই বৈঠকখানাই ছিল কলকাতার 'বাবু কালচার'-এর অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। বাবু কালচার বলে এই আড্ডাকে লঘু চোখে দেখা কোনওমতেই উচিত হবে না। নিয়মিত গানবাজনার আসর বসত ওই বৈঠকখানায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এই বৈঠকখানার গানবাজনার কথা লিখে গিয়েছেন।" ছাতুবাবুর মৃত্যুতে (১৮৫৬) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভীষণ শোক প্রকাশ এবং ছাতুবাবুর সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষকতার কথা সংবাদপ্রভাকরের সৌজন্যে আমাদের জানা। প্রভাকরের সব ফাইল যদিও আর প্রাপ্তব্য নয়, কিন্তু সাহিত্য পরিষদে যেটুকু রক্ষিত আছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখিত ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ির বৈঠকখানার গানবাজনার কোনও সংবাদ আমাদের চোখে পড়েনি। এমনকী 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে বাছাই সংবাদ নিয়ে সম্পাদিত বিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে সমাজচিত্রে'র প্রথম খন্ডেও এনিয়ে কোনও আলোকপাত নেই। আমাদের আশঙ্কা, ঈশ্বর গুপ্তের ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বৈঠকখানায় গানবাজনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনটির অনুসন্ধান না পাওয়া গেলে বৈঠকখানার ইতিহাসের একটি অমূল্য উপাদান চিরতরে হারিয়ে যাবে। বিশেষ করে গত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষে এই বিখ্যাত বৈঠকখানাটি যখন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের বাবা) বৈঠকখানার একটি অনুপত্র চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজ মহেন্দ্রনাথ, 'বৈঠকখানা ঘরেতে দেওয়ালগিরি, বেল লণ্ঠন ও হাঁড়ির লণ্ঠন ছিল। কারণ তখনকার দিনে বাতি বা তেলের গেলাসের প্রথা ছিল, দেওয়ালে নানারকম ছবি টাঙ্গান থাকিত। এইরূপে সব

বৈঠকখানাই বেশ সুসজ্জিত ছিল। তবে বিশ্বনাথ দত্তের নিজের বৈঠকখানাটি বিশেষ রকমে সুসজ্জিত ছিল।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনী)। সিমলের দত্তবাড়ির অবস্থা যখন পরবর্তীকালে একেবারেই পড়ে যায়, তখন এর বৈঠকখানাটি স্বয়ং বর্ণনাকারেরও পূত স্পর্শ পেয়েছিল।

রাজেন্দ্র মল্লিকের সুবিখ্যাত কীর্তি মার্বেল প্যালেসের বৈঠকখানাটি ফুটবল মাঠের মতোই প্রশস্ত। বাড়ির উত্তরপুরুষ হীরেন্দ্র মল্লিকের স্মৃতিচারণায় বাড়ির সঙ্গীতমুখর পরিবেশের অকুস্থল হিসেবে সেই বৈঠকখানার কথা উঠে এসেছে। বর্ণনাটি পাঠকের মন কাড়বে নিশ্চয়ই, ''সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান। বৈঠকখানায় সঙ্গীতের মূর্ছনায় বিধৌত হবে রাগাশ্রিত কল্পকাহিনী। বাজাবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। আমার বাবা মৃগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় পণ্ডিতজীকে প্রশ্ন করলেন, আজকের অনুষ্ঠান আমি রেকর্ড করব, আমার বৈঠকখানা থেকে। আপনার আপত্তি নেই তো? উনি কোনও দ্বিরুক্তি না করেই বললেন, অবশ্যই মল্লিক মশাই, আপনাদের মতো সমঝদার লোক। কি বলছেন! তখনই আমার ডাক পড়লো। আমি তো আত্মহারা। UHER এবং GRUNDIG TK 54 নিয়ে তোড়জোড় করে বসে পড়লাম। সারা রাত্রি ব্যাপী অনবদ্য সাতটি তারের মাধ্যমে গান, দরবারি-কানাড়া, একটি মাত্র রাগ বাজল সেদিন রাত্রে। আজও যেন সেই রাগের চরিত্রগুলো মনে করিয়ে দেয় সঙ্গীতের সংজ্ঞা। কত রাগ-রাগিনী, আফ আখড়াই থেকে ফুল আখড়াই, নিকি আশ্রুনের গান থেকে বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের অনুষ্ঠান এবাড়ির বৈঠকখানায় হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।" (হীরেন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য দেওয়ান রামলোচন ঘোষের ৪৬, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের বৈঠকখানাটি। এই বৈঠকখানা সংলগ্ন হলঘরেই বসত গানের আসর। বাড়ির উত্তর-পুরুষ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ নিজে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর পুত্র মন্মথনাথ ঘোষ ছিলেন সুরেশ সঙ্গীত সংসদের সভাপতি। বাড়িতে ঢুকতে গেলে যেহেতু বৈঠকখানা পেরিয়েই গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়, তাই এখানে আসা বহু বিদগ্ধ সঙ্গীতশিল্পীর পদধূলি পড়েছে এঁদের বৈঠকখানায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই বৈঠকখানায় এসেছিলেন। বৈঠকখানার চার দেওয়ালে সারি সারি এখনও টাঙানো রয়েছে ধ্রুপদী গাইয়ে বাজিয়েদের ছবি। কবীর, সুরদাস থেকে ভীস্মদেব চট্টোপাধ্যায়-নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়— কে নেই তাতে?

জায়গাটা আদতে ছিল রাজা নবকৃষ্ণের নাচঘর। শোভাবাজার রাজবাড়ির বাহিরবাটীর দোতলায়। পরবর্তীকালে তাঁর দত্তকপুত্র গোপীমোহনের সন্তান 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রণেতা স্যার রাধাকান্তের আমলে তাই পরিণত হলো বৈঠকখানায়। উনিশ শতকের রেনেসাঁর হিল্লোল তুলে সেই বৈঠকখানায় একদা পদার্পণ করেছিলেন রামমোহন, রামকমল সেন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন অবধি। স্থান সংকুলানের কারণে পরবর্তীকালে রাধাকান্ত দেব পাশেই 'নাটমন্দির' তৈরি করলে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজবাটীর বৈঠকখানা তার জৌলুস হারায়। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ৩৩, আর, রাজা

খেলাত চন্দ্র ঘোষের বাড়ির বৈঠকখানা— লালঘর। ছবি : শিবু ঘোষ

KALPATARU AGROFOREST ENTERPRISES (P) LTD.

(Leading Raw materials supplier to the Paper & Rayon Mills in India)

Head Office

22, Stephen House (II nd Floor)
56E, Hemanta Basu Sarani (Old 4E, B.B.D. Bagh)
Kolkata - 700001
Phone : 033-22431056 / 22485101 / 22311182
Fax : 033-22101238
E-mail : Kalptaru@cal.vsnl.net.in

Branch Office

"Panchvati",
2/517, Vijay Khand Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Uttar Pradesh
Phone : 3021536

নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের কেশর-ঝরা সিংহদরজার পেছনে স্রেফ কাঠামোটুকু নিয়ে নিজের অস্তিত্বের কথা সদর্পে জানান দিচ্ছে সে। (তথ্যসূত্র : প্রতীপ দেব)।

৪৭, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের খেলাত চন্দ্র ঘোষের প্রাসাদোপম ভবনটির বৈঠকখানাটির নাম লালঘর। কারণ ঘরের দেওয়ালের রং ছিল লাল। কালের বিবর্তনে তা বর্তমানে গোলাপীতে পরিণত। এই বাড়ির উত্তরপুরুষ সিদ্ধেশ্বর ঘোষের সাহেবীয়ানার কথা স্মৃতি মিত্র তাঁর 'বড় বাড়ির ছোট স্মৃতি' বইতে আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুর ছিল ছয় বোন। এঁদের সন্তানরা অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বরবাবুর ভাগ্নেরা অধিকাংশ সময়টাই কাটাতেন তাঁদের মামারবাড়িতে। এই ভাগ্নেদের নিয়ে প্রতিদিনই বৈঠকখানায় আড্ডা বসাতেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। রকমারি গল্প হোত। মায় প্ল্যানচেটও। এমনকী ভাগ্নেদের নিয়ে 'চিরকুমার সভা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'দত্তক পুত্র'ইত্যাদি নাটকের অভিনয়ও সিদ্ধেশ্বরবাবুর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় লালঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। (তথ্যসূত্র : প্রদীপ কুমার ঘোষ)।

বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়ির গৃহদেবতা মদনমোহন। ইনি সকাল সাড়ে ন'টায় শয়নকক্ষ ত্যাগ করে আসেন বাড়ির দোতলার সুপ্রশস্ত দরবার হলে, মিত্রবাড়ির মানুষজন যাকে মদনমোহনের বৈঠকখানা হিসেবে চিহ্নিত করছেন। সেখানে সাধারণের অভাব অভিযোগ শোনেন, বিচার করেন। দুপুর বারোটায় চলে যান ভোজনের জন্য ভোগ ঘরে। তারপর বিশ্রাম নিয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আসেন তাঁর বৈঠকখানায়। থাকেন রাত সাড়ে আটটা অবধি। বনেদী বাড়ির জাগ্রত গৃহদেবতা দেখেছি, তাঁদের বৈঠকখানাও দেখেছি। কিন্তু 'গৃহদেবতার বৈঠকখানা' সম্পূর্ণ অভিনব। গোকুল মিত্রের আমল থেকে সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। (তথ্যসূত্র : নুপূর মজুমদার)।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরশমণি

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে বৈঠকখানার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ঠাকুর, স্বামীজী সপার্ষদ যখন ভক্ত ও অনুরাগীদের বাড়িতে যেতেন, তখন এঁরা অন্দরমহলে জনপ্রিয় হলেও এঁদের প্রাথমিক অভ্যর্থনাটুকু কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির বৈঠকখানাতেই হোত। সেদিক দিয়ে যে বিপুল সংখ্যক গৃহ এদের পদধূলি-ধন্য হয়েছে সেইসব বাড়ির বৈঠকখানার পরিচয় তুলে ধরলে গ্রন্থের কলেবর কী দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের কামারপুকুরের বাড়ির বৈঠকখানার আয়তনের পূর্ণ মাপ-জোক ও তার স্কেচ সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গে রয়েছে বিস্তারিতভাবে। এদিক দিয়ে বৈঠকখানার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর আদেশে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পার্শ্ব-সহচর ও ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ার সিহড়ের পৈতৃকভিটের বৈঠকখানাটিকে (নির্মাণ ১৮৪৯) দেবী চণ্ডীর মন্দিরে পরিণত করেছিলেন। এবং কলাপাতার ওপর তাঁর স্বহস্তে লিখিত পুঁথি 'শ্রীচণ্ডীকা' সেই মন্দিরে আজও শোভাবর্ধন করছে। এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরশপ্রাপ্ত কয়েকটি বৈঠকখানার ব্যাপারে অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণে গঙ্গাতীরে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীর তিনতলা বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়ালে মা মেরীর কোলে শিশু যীশুর চিত্র দর্শন করে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন এবং তিনদিন ওইভাবে থাকার পর পঞ্চবটীতে যীশুর দিব্যদর্শন লাভ করেন। এই বৈঠকখানা ঘরেই ঠাকুর একবার স্বামীজীকে স্পর্শ করলে তাঁর বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পায় এবং ঠাকুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বামীজী তাঁর এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং এই বিষয়ে তিনি রামকৃষ্ণের বিশেষ লীলা সহায়ক বলে মন্তব্য করেন। (ব্যক্তি-পরিচয়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম কথিত, অখণ্ড সংস্করণ)।

সুদূর জয়পুরে সংসারচন্দ্র সেনের বাড়ি। পাকা বাড়ি নয়। 'চারচালা'র মতো একটি ঘরে বৈঠকখানায় কৌপীনধারী এক সন্ন্যাসী। বাড়ির বংশধর ও বিখ্যাত লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন, ১৮৯২ কিংবা ১৮৯৩ সালের কথা। স্বামী গম্ভীরানন্দের হিসেবে সময়টা ১৮৯১ সাল। সহজবোধ্য কারণেই তখনও তিনি বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ নন, নেহাতই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। তবুও এই বৈঠকখানা অবিস্মরণীয় কারণ তরুণ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার বিচ্ছুরণ এই চালাঘরকে সূর্যালোকের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছিল। জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্মৃতিকথায় জানা যাচ্ছে, স্বামীজী সংসারচন্দ্রের এই বৈঠকখানায় গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিতের' বিখ্যাত 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই', চৈতন্যলীলার 'এল কৃষ্ণ এল ওই, বাজল বাঁশরী' প্রভৃতি গান ছাড়াও 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' ইত্যাদি গেয়েছিলেন। বাড়ির এক বয়জ্যেষ্ঠার স্মৃতিচারণার উল্লেখ করে জ্যোতির্ময়ী দেবী জানিয়েছেন গভীর রাত্রে বৈঠকখানা ঘরে বসে জগতকে উথাল-পাতাল করে সন্ন্যাসী গাইছেন, 'নিবিড় আঁধার মাঝে মা তোর চমকে অরূপ রাশি'। (স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সংকলিত গ্রন্থে 'জয়পুরে স্বামীজী' শীর্ষক জ্যোতির্ময়ীদেবী লিখিত প্রবন্ধ)।

১৮৮৩ সালের ২৬ নভেম্বর মণিমোহন মল্লিকের বাড়ির বৈঠকখানায় ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব কীর্তন (যার অসাধারণ বর্ণনা সারদানন্দ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে) এবং ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিজয় করে কলকাতায় পদার্পণের পর বাগবাজারের পশুপতি বসু নন্দলাল বসুর যে বাড়িতে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়, আহারাদির পর সেই বাড়ির দোতলায় সুসজ্জিত বৈঠকখানায় তাঁর পাশ্চাত্য-বিজয়ের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করা (স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতিকথা, স্মৃতির আলোয় স্বামীজী); আমাদের বিচারে

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরশপ্রাপ্ত বৈঠকখানার ইতিহাসে এই ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বাবুদের বৈঠকখানা

সৃষ্টিশীলতা যেমন বৈঠকখানার অন্যতম চরিত্র, তেমনি কিছু সৃষ্টিছাড়া বৈঠকখানার কথা না বললে এ ইতিহাস ফুরোবার নয়। বাবু কালচারের কিছু কদর্য দিক ছিল যেগুলো মূলত বাহিরবাড়ি হবার কারণে বৈঠকখানা ঘরেই প্রতিফলিত হয়েছে। উৎসব-পার্বণে বিশেষ করে বাঙালি-র জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বৈঠকখানায় কীরকম বেলেল্লাপনা হোত তা দেখিয়েছেন শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন সিংহ, তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়'। হুতোমের অনবদ্য লেখনী, 'কোনওখানে পুজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিশ রেখেছেন— বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেছেন।" হুতোমের বিদ্‌ঘুটে বর্ণনা, ''কোনও বাড়ির বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নের সেঁধুতে ভরসা হয় না— পাছে কর্মকর্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয় ত বাবু ঘুমুচ্ছেন, নয় বেরিয়ে গ্যাচেন, দালানে জনমানব নাই, নেমন্তন্নে কার সমুখে যে প্রণামী টাকাটি ফেলবেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না, কর্মকর্তার ব্যাভার দেখে প্রতিমে পর্যন্ত অপ্রস্তুত হন।"

হুতোমের ভাষাই অবিকল নকল করে লেখা 'দশঅবতারের এক অবতার' (প্রকৃত নাম রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ) প্রণীত 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' নিবন্ধে এ-সংক্রান্ত কিছু কুচিত্র রয়েছে। যেমন বাবুদের খেউড়ের উল্লেখ, ''এদিকে ছোটবাবুর বৈঠকখানা ইয়ারগোছের ব্রাহ্মসমাজের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তিনি সময় বয়ে যায় দেখে গ্লাস, জল ও কাক্‌স্কুর জন্য চাকরদের গালাগালি দিতে লাগলেন, এই সকল দেখে শুনে দিনমণি লজ্জায় আস্তে আস্তে গাছের আগডালে আগডালে ক্রমে ক্রমে সরে পড়লেন।" রাত যত বাড়ে, বৈঠকখানায় নেশাও তত চড়ে, ''ছোটবাবুর বৈঠকখানায় তবলায় চাঁটি পড়েচে, আর 'শিবাবা, শিবাবা'! শব্দ উঠছে। ক্রমে বাবুর বৈঠকখানার ঘড়িতে টুন টুন করে দশটা বেজে গেল, বড়বাবুরও মৌতাতের সময় হয়ে এল।" বাবুদের বৈঠকখানায় আরও বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানার প্রসঙ্গ, ''এখন কেবল বাবুদের বৈঠকখানায় 'ইয়ার ভোজে'র উদ্যোগ হতে লাগলো। বাড়িতে 'গোপাল অধিকারী'র যাত্রা। ... বাবুর বৈঠকখানায় কেউ বা ভক্তিভরে 'গির্জ্জে' করছিলেন, করতে করতে তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল, সুতরাং সেই মখমলের বিছানাতেই তিনি 'প্লিজ লেট মি গো আউট' করে ফেললেন; অন্যান্য বাবুরা 'বাবা! কিশু বলো না, হুকোর জল পড়চে' বলে হোররা দিতে লাগলেন।... বৈঠকখানায় বাবুদের গটরা চলতেছে, এমন সময়ে আসরে কেষ্ট নামলেন! আর বাবুদের রাখে কে? অমনি নেমে এসে 'বাবা রে হনু! তুই লঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল?' বলে চেঁচাতে লাগলেন।"

রাত বাড়লে, তখন আর শুধু ইয়ার-বক্সী নয়, বাহির-গৃহে যে বারবণিতাদের গতিবিধি ক্রমে অবাধ হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ''এদিকে নিশানাথ (চাঁদ) হাসিতে হাসিতে নারিকেল গাছের উপর হইতে ক্রমে গগনে উঠিতে লাগিলেন। বারবধূগণ বিরষ বদনে ক্ষুণ্য চিত্তে প্রদীপ জ্বালিতে আরম্ভ করিয়া যথাযোগ্য বৈটকখানায় হুঁকা হস্তে আগমন করিলেন। (পাঠক এস্থলে অনেক কথা ছিল কিন্তু সে সকল বর্ণনা করিতে গেলে পুস্তক দীর্ঘ হইয়া উঠে, সুতরাং পরিতাজ্য)।" (বাদমাএস জব্দ, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কলকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা, দেবাশিস বসু সম্পাদিত)।

দোষে-গুণে মেশানো বাঙালির বৈঠকখানার গরিমা আজ অস্তমিত। সেকালে বৈঠকখানার চরিত্রই যে সেই বাড়ির চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলোকে ফুটিয়ে তুলতো এখন আর তা গোপনীয় কোনও ব্যাপার নয়। আজ বনেদী বাড়ির চরিত্রই যেখানে পায়রার খোপের মতো ফ্ল্যাটবাড়ির খপ্পরে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, সেখানে বৈঠকখানা তার চরিত্র ধরে রাখবে কি করে? বৈঠকখানা বেঁচে থাকবে বাঙালির নষ্ট্যালজিয়ায়। যতদিন বাঙালিয়ানা থাকবে, ততদিন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, স্মৃতিটুকু থাক। □

কৃতজ্ঞতা :- বারিদবরণ ঘোষ, হরিপদ ভৌমিক, হীরেন্দ্র মল্লিক, অশোক উপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, নবকুমার ভট্টাচার্য ও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

নিজের দেশকে অতি সামান্যই দিচ্ছি, তাই নিজের দেশকে পাচ্ছি না

বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়াইয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অদি সামান্যই দিতেছি, সেজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, একথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না—সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের আকস্মিক কারণ হইতে নয়। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালান্তর—'স্বাধিকার প্রমত্তঃ'

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

ভারতীয় চিন্তাধারায় বৃহৎ সংখ্যা

প্রদীপ মজুমদার

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয়রা বৃহৎ সংখ্যার কল্পনা করতে পারতেন। যজুর্বেদে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুক্লযজুর্বেদের সপ্তদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রটি তুলে ধরছি—

"ইসা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ খড্ডেকা চ দশ চদশ শতং চশতং চ সহস্রং চ সহস্রং চা যুতং চাযুতং চ নিযুতং চ নিযুতং চ প্রযুতং চার্বুদং চ ন্যর্বুদং সমুদ্রশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ পরার্ধশ্চৈ মৈ অগ্ন ইষ্টকা"।

এর বঙ্গানুবাদ হলো এইরকম— "... তারা এক দশ শত সহস্র নিযুত কোটি, অর্বুদ ন্যর্বুদ অব্দ খর্ব নিখর্ব, মহাপদ্ম, শঙ্কু সমুদ্র পরাধ রূপে বর্তমান।

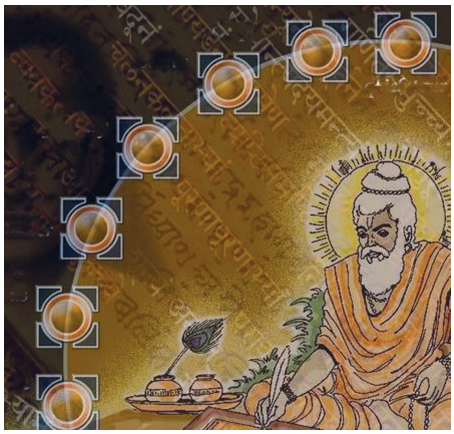

অর্থাৎ এখানে (১) এক = $১০^{০}$, (২) দশ = $১০^{১}$, (৩) শত = $১০^{২}$, (৪) সহস্র = $১০^{৩}$, (৫) অযুতম্ = $১০^{৪}$, (৬) নিযুতম্ = $১০^{৫}$, (৭) প্রযুতম্ = $১০^{৬}$, (৮) অর্বুদ = $১০^{৭}$, (৯) ন্যর্বুদ = $১০^{৮}$, (১০) খর্ব = $১০^{৯}$, (১১) নিখর্ব = $১০^{১০}$, (১২) মহাপদ্ম = $১০^{১১}$, (১৩) শংকু = $১০^{১২}$, (১৪) সমুদ্র = $১০^{১৩}$, (১৫) মধ্য = $১০^{১৪}$, (১৬) অন্ত = $১০^{১৫}$, (১৭) পরার্ধ = $১০^{১৬}$।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যজুর্বেদের ১৭/২ শ্লোকে খর্ব, নিখর্ব, মহাপদ্ম, শংকু এগুলি নেই। মহীধর এই শ্লোকগুলির ভাষ্যে এই চারটি সংখ্যা উল্লেখ করেছিলেন। অর্থাৎ ১৭/২-এর মান অনুবাদ করলে আমরা বলতে পারি সমুদ্র = $১০^{৯}$, মধ্য = $১০^{০}$, অখন্ত = $১০^{১১}$ এবং পরার্ধ = $১০^{১২}$।

রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের আঠাশ পর্বের ৩৩ থেকে ৪১ শ্লোকগুলি তুলে ধরতে "শতং শতসহস্রাণাং কোটি মাহুর্মণীষিণঃ। শতং কোটিসহস্রাণাং শঙ্করিত্যভিধীয়তে।"৩৩

শতংশঙ্কুসহস্রাণাং মহাশঙ্কুরিতি স্মৃতঃ। মহাশঙ্কুসহস্রাণাং শতং বৃন্দমিহোচ্যতে। ৩৪

শতং বৃন্দসহস্রাণাং মহাবৃন্দমিতি স্মৃতম্। মহাবৃন্দসহস্রাণাং শতং পদ্মমিহোচ্যতে। ৩৫

শতং পদ্মসহস্রাণাং মহাপদ্মমিতি স্মৃতম্। মহাপদ্মসহস্রাণাং শতং খর্বমিহোচ্যতে।। ৩৬

শতং খর্ব সহস্রাণাং মহাখর্বমিতি স্মৃতম্। মহাখর্বসহস্রাণাং সমুদ্রমতিধীয়তে। শতং সমুদ্রসাহস্রমোঘ ইত্যভিধীয়তে।। ৩৭

শতমোঘসহস্রাণাং মহৌধা ইতি বিশ্রুতঃ এবং কোটিসহশ্রেণ সঙ্কুনাঞ্চ সচেত চ। মহাশঙ্কুসহস্রেণ তথা বৃন্দশতেন চ।। ৩৮

মহাবৃন্দসহশ্রেণ তথা পদ্মশতেন চ। মহাপদ্মসহশ্রেণ তথা খর্বশতেন চ।। ৩৯

সমুদ্রেণ চ তেনৈব মহৌখেন তবৈব চ। এস কোটিসহৌঘেন সমুদ্রসদৃশেন।। ৪০

এর মর্মার্থ হলো— একশত শতসহস্রে এক কোটি আর এক শত সহস্র কোটিতে শঙ্কু হয়।। ৩৩।। এক শত সহস্র শঙ্কুকে বলা হয় মহাশঙ্কু। আর এক শত সহস্র মহাশঙ্কুকে বলা হয় বৃন্দ।। ৩৪।। শত সহস্রবৃন্দকে বলা হয় মহাবৃন্দ, শতসহস্রমহাবৃন্দকে বলা হয় পদ্ম।। ৩৫।। শত সহস্রপদ্মকে বলা হয় মহাপদ্ম। আর শতসহস্র মহাপদ্মকে বলা হয় খর্ব।। ৩৬।। শত সহস্র খর্বকে বলা মহাখর্ব। শতসহস্র মহাখর্বকে বলা হয় সমুদ্র। শত সহস্র সমুদ্রকে বলা হয় ওঘ।। ৩৭।। শতসহস্র ওঘ সহৌঘ নামে বিখ্যাত। এইভাবে শতকোটি সহস্র শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু এবং শতবৃন্দ সংখ্যক বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সুগ্রীব এলো।

এ থেকে যে সংখ্যার সারণীটি পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ—

ভারতীয় লক্ষ স্কেল, শত সহস্র = এক লক্ষ		= $১০^{৫}$
১০০ লাখ	= ১ কোটি	= $১০^{৭}$
১ লাখ কোটি	= ১ শঙ্কু	= $১০^{১২}$
১ লাখ শঙ্কু	= ১ মহাশঙ্কু	= $১০^{১৭}$
১ লাখ মহাশঙ্কু	= ১ বৃন্দ	= $১০^{২২}$
১ লাখ বৃন্দ	= ১ মহাবৃন্দ	= $১০^{২৭}$

Kirti SOLAR

কীর্ত্তির সৌর গৃহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

কোনো সিকিউরিটি বা অগ্রিম টাকা লাগবে না

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত, গুণমাণে শ্রেষ্ঠ সৌর গৃহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা)

কীর্ত্তি ৪০ Wp সৌর গৃহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

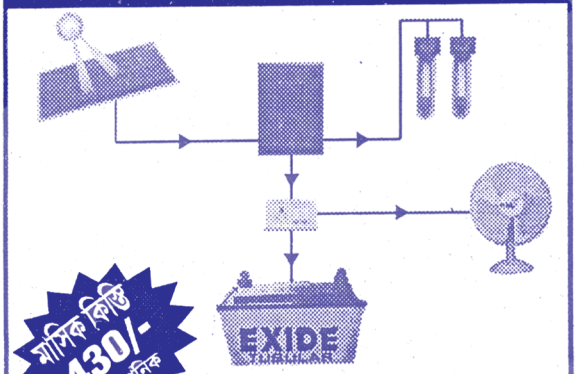

কীর্ত্তি ৭৫ Wp সৌর গৃহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

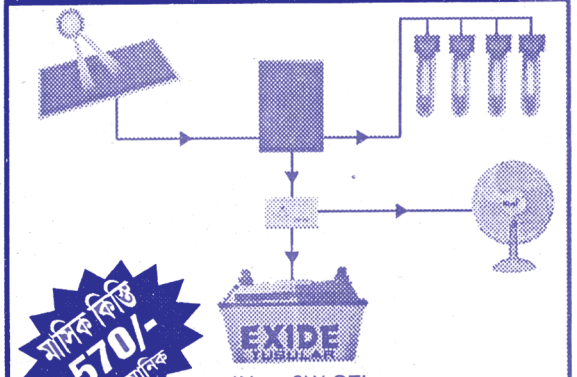

- ৫ বৎসরের ওয়ারেন্টি ও ১৫ বৎসরের জন্য মডিউলের ওয়ারেন্টি।*
- ৫ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত EXIDE Tubular Battery.*
- লোন পরিশোধের মেয়াদ ৫ বৎসর।
- ১ বৎসরের জন্য বিনামূল্যে বিমার ব্যবস্থা।
- নিকটবর্তী সার্ভিস সেন্টার।

Head Office

KIRTI SOLAR LTD.
56D, Mirza Ghalib Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 016
Ph. : 033 4064 6077-79, Fax : 033 4064 6080
E-mail : solar@pekon.in Website : www.pekon.in

Mobile : 9007112644, 9831052969

১ লাখ মহাবৃন্দ	= ১ পদ্ম	= $১০^{৩২}$
১ লাখ পদ্ম	= ১ মহাপদ্ম	= $১০^{৩৭}$
১ লাখ মহাপদ্ম	= ১ খর্ব	= $১০^{৪২}$
১ লাখ খর্ব	= ১ মহাখর্ব	= $১০^{৪৭}$
১০০০ মহাখর্ব	= ১ সমুদ্র	= $১০^{৫০}$
১ লাখ সমুদ্র	= ১ ওঘ	= $১০^{৫৫}$
১ লাখ ওঘ	= ১ মহৌঘ	= $১০^{৬০}$

বলা বাহুল্য, ৩৪-৪০ শ্লোকগুলিতে রামের সৈন্য সংখ্যা বলা হয়েছে। ওই তিনটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

''এইভাবে শতকোটি সহস্র শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু এবং শতবৃন্দ সংখ্যক বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সুগ্রীব আসছে।। ৩৮।। আসছে সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, মহাপদ্ম সহস্র এবং শত খর্ব সংখ্যক বানর সঙ্গে নিয়ে।। ৩৯।।

তেমনি সেই সমুদ্র, মহৌঘ, কোটি মহৌঘ এবং ওই রকমেরই সমুদ্র তেমন মহৌঘ এবং কোটি মহৌঘ সমুদ্রতুল্য বানরসেনার দ্বারা তিনি পরিবৃত।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে রামের সৈন্য সংখ্যা হলো — $১০০০.১০^{৭} + ১০.১০^{১২} + ১০০০.১০^{১৭} + ১০০.১০^{২২} + ১০০০.১০^{২৭} + ১০০.১০^{৩২} + ১০০০.১০^{৩৭} + ১০০.১০^{৪২} + ১০০.১০^{৫০} + ১০০.১০^{৬০} + ১০^{৭}.১০^{৬০}$।

অর্থাৎ $১০.^{১০} + ১০^{১৪} + ১০^{১৬} + ১০^{২৪} + ১০^{৩০} + ১০^{৩৪} + ১০^{৪০} + ১০^{৪৪} + ১০^{৫২} + ১০^{৬২} + ১০^{৬৭}$।

এত বড় সৈন্যদল কোনওমতেই হতে পারে না। যদি প্রত্যেক সৈন্য ১ বর্গফুট এলাকা নেয় তবে $১০^{২৪}$ সৈন্যকে দশ কোটির মতো পৃথিবী লাগবে (অবশ্যই জল-স্থল মিলে)। মনে হয় এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন কঠ বা কাঠক সংহিতা, কপিস্থল কঠ সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, পঞ্চ বিংশ সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তান্ড্য ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, শাঙ্খাসন শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি ভারতীয় গ্রন্থে বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ আছে।

জৈন গ্রন্থে বিরাট বিরাট সংখ্যার উল্লেখ আছে। অমলসিদ্ধি গ্রন্থে আমরা $১০^{৯৬}$ সংখ্যার উল্লেখ দেখতে পাই। $১০^{১৮}$ ছাড়াও অমলসিদ্ধিতে যে সংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলোও (১) সিদ্ধি = $১০^{১৯}$, (২) দশক্ষিতি, (৩) ক্ষোভ, (৪) দশ ক্ষোভ, (৫) রিদ্ধি, (৬) দশ রিদ্ধি, (৭) সিদ্ধি, (৮) দশ সিদ্ধি, (৯) নিধি, (১০) দশ নিধি, (১১) ক্ষোণি, (১২) দশ ক্ষোণি, (১৩) কল্প, (১৪) দশ কল্প, (১৫) প্রাহি, (১৬) দশ প্রাহি, (১৭) ব্রহ্মাণ্ড, (১৮) দশ ব্রহ্মাণ্ড, (১৯) রুদ্র, (২০) দশ রুদ্র, (২১) তান, (২২) দশ তান, (২৩) ভার = $১০^{৪১}$, (২৪) দশ ভার, (২৫) চূর্ণ, (২৬) দশ বুর্জ, (২৭) ঘন্টা, (২৮) দশ ঘন্টা, (২৯) মূল, (৩০) দশমূল, (৩১) পচুর, (৩২) দশ পচুর, (৩৩) দশ পচুর, (৩৪) নয় = $১০^{৫}$, (৩৫) দশ লব, (৫৬) কাব, (৫৭) দশ কাব, (৩৮) অপার, (৫৯) দশ অপার, (৬০) নট, (৬১) দশ নট, (৬২) গিরি, (৬৩) দশ গিরি = $১০^{৬০}$ (৬৪) মন = $১০^{৬১}$, (৬৫) দশ মন, (৬৬) বন, (৬৭) দশ বন, (৬৮) শঙ্কু, (৬৯) দশ শঙ্কু, (৭০) বাণ, (৭১) দশ বাণ, (৭২) বল, (৭৩) দশ বল = $১০^{৭০}$, (৭৪) ঝাড়, (৭৫) দশ ঝাড়, (৭৬) ভীম, (৭৭) দশ ভীম, (৭৮) বজ্র, (৭৯) দশ বজ্র, (৮০) লোট, (৮১) দশ লোট, (৮২) নজে, (৮৩) দশ নজে, (৮৪) পট, (৮৫) দশ পট, (৮৬) তম, (৮৭) দশ তম, (৮৮) দ্রম্ভ, (৮৯) দশ দ্রম্ভ, (৯০) কৈক, (৯১) দশ কৈক, (৯২) অমিত, (৯৩) দশ অমিত, (৯৪) গোন $১০^{৯১}$, (৯৫) দশ গোন, (৯৬) পরামিত, (৯৭) দশ পরামিত, (৯৮) অনন্ত = $১০^{৯৫}$, (৯৯) দশ অনন্ত = $(০)^{৯৬}$।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বৃহৎ সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ললিত বিস্তারের কথা তুলে ধরা হলো এখানে—

(১) কোটি = $১০^{৭}$, (২) অযুত = $১০^{৯}$, (৩) নিযুত = $১০^{১১}$, (৪) কঙ্কর = $১০^{১৩}$, (৫) বিবর = $১০^{১৫}$, (৬) অক্ষোভ্য = $১০^{১৭}$, (৭) বিবাহ = $১০^{১৯}$, (৮) উৎসঙ্গ = $১০^{২১}$, (৯) বহুন = $১০^{২৩}$, (১০) নাগবল = $১০^{২৫}$, (১১) তিটলম্ব = $১০^{২৭}$, (১২) ব্যবস্থান প্রজ্ঞাপ্ত = $১০^{২৯}$, (১৩) হেতুহিল = $১০^{৩১}$, (১৪) করকু /করনু = $১০^{৩৩}$, (১৫) হেতুবিন্দ্রিয় = $১০^{৩৫}$, (১৬) সমাপ্ত লম্ব = $১০^{৩৭}$, (১৭) গণনাগতি = $১০^{৩৯}$, (১৮) নিরবদং = $১০^{৪১}$, (১৯) সুন্দ্রাবন = $১০^{৪৩}$, (২০) সর্ববন = $১০^{৪৫}$, (২১) বিসংজ্ঞ গতি = $১০^{৪৭}$, (২২) সর্বসংজ্ঞা = $১০^{৪৯}$, (২৩) বিভূতি ঈগমা = $১০^{৫১}$, (২৪) তল্লক্ষণ = $১০^{৫৩}$।

অবশ্য বসুবন্ধর লেখার $১০^{৫৯}$ = অসংখ্য উল্লেখিত আছে। অবশ্য কাচ্চাচনের পালি ব্যাকরণে অসংখেয় = $১০^{১৪০}$ বলা হয়েছে, এখানে কোটি = $১০^{৭}$ স্কেল হিসাব ধরা হয়।

সংখ্যা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যেত, স্থানাভাবের জন্য পরে কোনও সময় আলোচনা করা যাবে।

এবার ডাটা পেশ করছে
এক মুড়মুড়ে মচমচে
মশলাদার খাবার
ডাটা
পাঁপড়
DUTA
PAPAD
মশলা নির্মাতার কাছ থেকে
মশলাদার
মজাদার পাঁপড়

With Best Compliments from :-

Vinar Systems Pvt. Limited

Registered Office & Head Office
5A, Lord Sinha Road
Kolkata - 700 071
Phone : 3057 5000 / 5001 / 5002
Fax : 2282 3171

E-Mail :-

Unit Handling Division ➢ vinar_uhd@vinar.in
Storage Solution Division ➢ vinar_vsa@vinar.in
Bulk Material Handling Division ➢ mhp1@vinar.in
vinar_mhp@vinar.in

Web Site ➢ www.vinar.co.in

Leading Manufacturers of Unit Handling, Bulk Material Handling & Storage Equipment

R K Global wishes you a very
HAPPY DURGA PUJA

R K Global
NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX SX | NSDL

For more info :
call - 033-4004-0999
sms RKG to 56677
log on to www.rkglobal.net

SERVICES OFFERED
Equity ▪ Derivatives ▪ Commodity ▪ Currency
Depository Services ▪ IPO Services
Mutual Fund Services ▪ NRI/PIS Services

Regional Off
2 Saklat Place, Suite-9, Kolkata - 700 072
P : + 91 -33 -4014 1999 F : + 91 -33 -2212 8878, E : care.kolkata@rkglobal.in

Regd. Off
61, 6th Floor, Mittal Chambers, 228, Nariman Point, Mumbai- 400 021
P : + 91 -22 -4210 5555 F : +91 -22 -4210 5500, E : mumbai@rkglobal.in

Estd. 1928

GUPTA & COMPANY (P) LTD.

Manufacturers of :
Industrial Fragrances & Flavours. Aromatic Chemicals. Essential oils and Resinoids

Head Office : 68, Scindia House, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 91-11-23353962, 3, 4
Fax : 91-11-23353994, 23321644
e-mail : aroma@del2.vsnl.net.in

Regd. Office : XIV/294-95, Gali Mandi Pan, Sadar Bazar, Delhi-110006.
Ph : 23527795, 23540212

BRANCHES

* * *

MUMBAI
Sharaff Mansions
32, Princess Street,
Mumbai-400002.
Telefax : 022-22089859,
022-22061998

KOLKATA
66, Ezra Street,
Kolkata-700 001.
033-22254933
Fax : 033-22252226

BANGALORE
769/17, 1st Cross
Mahalaxmi Layout,
Bangalore--560 086.
Telefax : 080-23493042

With the best Compliments from :

SWISS MACHINERY CORPORATION

Govt. of West Bengal Approved Repairer and Manufacturer of Electronic Weighing Machine, Linearmeasure Platform scale. Counter scale and Maintenance Contractor of Weighing, Apparatus of All Makers and General Order Suppliers.

Sales Manager : A Mukherjee

(M) 9883420371, Sreenagar Mainroad,
Geetanjali, Chakgaria,
P.O.-Panchasaya-700094
10A, Asgar Mistri Lane, Kolkata-700046
Ph. : 23283817
Contact-*Chand Roy & Souvik Roy*
Mob. : 9831757045
9330094537, (L) 2328 3817

With the best Compliments from :

CHANDU ADAK

Land & Land Developer
Barasat, North 24 Parganas
Kolkata-700126
(M) : 9830960460

Swastika 22 October-2012, Durgapuja Spl.
Rs. 60.00, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012

দাম : ৬০ টাকা